বাংলা বলো

পবিত্র সরকার

উৎসর্গ

কুরচি ও তোতাকে
সস্নেহে
বাবা

হিগিনকাকু

গোলাপি বেড়ালছানার মতো ছোট্ট একটা বোন হয়েছে দশ বছরের ভন্টুর, নাম ঠিক হয়েছে তিন্নি। তিন্নি খিদে পেলে মিঁউ মিঁউ করে কাঁদে আর পেট ভরলেই ঘুমিয়ে পড়ে ফুরফুর করে নাক ডাকাতে থাকে।

রোববার সকালে হই-হই করে হিগিনকাকু এসে হাজির। কাঁধে টেপ-রেকর্ডার, মাইক্রোফোনের মাউথ-পিসটা তিন্নির মুখে ঠেকিয়ে—বললেন, "একটু কাঁদ তো রে মা, টেপ করে নিই।"

বাবার এই পিসতুতো ভাইয়ের হিগিন নামটা পৈতৃক নয়। পেশায় ভাষাবিজ্ঞানী বলে বার্নার্ড শ-র 'পিগমেলিয়ন' নাটকের প্রফেসর হিগিন্‌স নামে ভন্টুর বাবাই তাঁকে ডাকেন। সেটাই দাঁড়িয়েছে হিগিন। চুয়াল্লিশেই হিগিন একটি উজ্জ্বল টাক মোলায়েম ভুঁড়ি আর ভারী ফ্রেমের মোটা লেন্সের চশমা বাগিয়ে ফেলেছেন। আর ভাষাবিজ্ঞান চর্চা করে আর পড়িয়ে মাথায় খানিকটা ছিটও গজিয়েছে বলে সকলের ধারণা। ফ্রেঞ্চ-কাট দাড়ি বোধহয় টাকের দিক থেকে লোকের নজর সরিয়ে দেবার কৌশল।

“তা এত যন্তর-টন্তর কেন রে হিগিন?” ভন্টুর বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

হিগিনকাকু বললেন, “ব্যাপার আছে। তিন্নির বয়েস কত হল যেন?”

বাবা শুনে জানালেন, “উনিশ দিন।”

রহস্যময় মুখে হিগিনকাকু বললেন, “শোনো বড়দা, এবার তিন্নি মুখে নানারকম আওয়াজ করতে শুরু করবে। ইংরেজিতে যেসব আওয়াজকে বলে ‘কুয়িং’ তারপর আসবে, যাকে বলে, ‘ব্যাবলিং’। ‘কুয়িং’ মানে ‘গ্‌গু-গ্‌গু’ ধরনের আওয়াজ করা, আর ‘ব্যাবলিং’ হল ‘তাত্তা—দাদ্‌ দা গি-গি’ —এই সব নানারকম ধ্বনি গলায় আওড়ানো। তবে সব্বার আগে আসে ‘ক্রাইয়িং’ বা কান্না। এই কান্না থেকে তিন্নির কথা ফোটা পর্যন্ত সব আমি একটানা রেকর্ড করে রাখতে চাই। বউদিকে দেখিয়ে দিচ্ছি। টেপ উনিই করবেন। এটা নতুন রিসার্চ আমার। বাচ্চাদের কথা-শেখা একটা যা-তা মজার কাণ্ড।”

কাজের মেয়ে রাধা এসে হিগিনকাকুর প্রিয় কালো কফি এনে টেবিলে রাখতেই আবার ফস করে মাউথ-পিসটা তার মুখের সামনে বাড়িয়ে বললেন, “ও আধাদিদি, আত্তিরবেলা আমযাত্রা দেখতে যাবি নে?”

রাধা মুখে আঁচল চেপে দৌড়ে পালিয়ে গেল। হিগিনকাকু ভন্টুর পিঠে কিলো দশেক ওজনের একটি থাপ্পড় বসিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, “কী রে, ভাষাবিজ্ঞানী হবি?”

ভন্টু ভয়ে-ভয়ে বলল, “অনেক ভাষা শিখতে হবে নাকি?”

“নিয়েৎ নিয়েৎ!” বাংলায় তেমন জোর আসে না বলে এবার রাশিয়ান ভাষায় ‘না-না’ বলে উঠলেন হিগিনকাকু। তারপর খিচুড়ি করে বললেন, “লেকিন ইয়ে বাত সহী হ্যয় কি—দু-চারটে ভাষা জানলে কাজের সুবিধে হবে।”

ভন্টু বাবার কাছে আবদার ধরল, “হ্যাঁ বাবা, আমি ভাষাবিজ্ঞানী হব, টেপ-রেকর্ডার চালাব।”

বাবার হাসিকে থমকে দিয়ে হিগিনকাকু লাফিয়ে উঠে বললেন, “উত্তম! তাহলে শিখে নাও কী করে ফরাসি ভাষায় ইউ [U] উচ্চারণ করবে। ঠোঁট দুটো গোল আর ছুঁচোলো করো, যেন উ বলবে। করেছ? এবার ওই ঠোঁটেই জোরে ঈ-ঈ উচ্চারণ করো। একটু তেড়েফুঁড়ে করতে হবে বাবা।” বলে নিজেই ‘বুঈঈ’ করে এমন একটা আওয়াজ হাঁকড়ালেন যে...

তাঁর মুখের সামনে উড়তে থাকা একটা রক্তলোভী মশা ওই বুঈঈ-র প্রলয়ংকর ঝাপটায় শূন্যে ছিটকে, গন্ডাচারেক ডিগবাজি খেয়ে, আর্তনাদ করে, ভবলীলা সাঙ্গ করল।

ও ঘরে তিন্নি কেঁদে উঠল।

কোন্‌টা ঠিক, কে বলবে

এবার আর বাবার হো-হো হাসিকে থামানো গেল না। মেঝে থেকে মৃত মশাটিকে দু-আঙুলে তুলে ধরলেন, তারপর আর-একটা আদরের নাম ডেকে বললেন, "হিগিনবথাম, তুই অবাক করলি। ভাষাবিজ্ঞান দিয়ে এমন চমৎকার মশা মারা যায় কে জানত? রোজ সন্ধেবেলায় এসে হাজার দুয়েক ফরাসি ইউ বলে যাস তো এখানে। মশা-তাড়ানো ওষুধ আর কিনব না আমরা।"

ততক্ষণে তিন্নিকে নিয়ে মা এসে গেছেন বাইরের ঘরে, পুজোর ঘর থেকে ঠাম্মাও এসে পড়েছেন। হইচই শুনে রাধাও দরজার আড়ালে এসে দাঁড়িয়েছে। ঠাম্মা এসে যাওয়ায় হিগিনকাকু চট করে তাঁকে প্রণাম করলেন, ঠাম্মা আশীর্বাদ করে জিজ্ঞেস করলেন, "নানু, দুফইরে খাবি ত এইখানে?"

হিগিনকাকুর আসল ডাকনামটা বাড়িতে এই একটি মানুষই বলেন। কাকু তক্ষুনি বিক্রমপুরি সেজে বললেন, "কন কী মামিমা, খামু না? আমারে গারে দোইরা খ্যাদাইলেও ত না-খাইয়া যামু না এইখান থিকা!" তারপর বাবার দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমার বাড়িতেও যা-তা কাণ্ড একটা। মামিমা তিরিশ বছর ধরে কলকাতায় আছেন, কিন্তু তাঁর ভাষা যে-পদ্মাপারের, সেই পদ্মাপারের। এদিকে ইংলিশ-মিডিয়াম ইস্কুলে-পড়া বউদি আমার ইংলিশ মিডিয়ামের বাংলা

চালাচ্ছে, জিভটিভ উলটে বলছে "আমাড় বাবাড় বাড়ি।" শুনলে গা শিউরে ওঠে। আর তোমাদের ওই রাধা, দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার 'আয়দিঘি' অর্থাৎ রায়দিঘির কাছে যার বাড়ি, দেইখে শুইনে হিসেব কইরে কথা বইললেও সে বলে যায়, "ব্যাটারা অ্যাঙ নম্বরের ঠগ, ওজ মাচের রোজনে কম দেবে।" হাতের কাছে ভন্টুর ঠাকুমাকে পেয়ে এবার তাঁরই মুখে মাইক্রোফোন ধরলেন হিগিনকাকু, "মামিমা, হেই কথাটা কন দেহি—হেই জে ড্যাহার মাইনশেরা কয়—আমরা কওনের বেলায় তো হোনাই কই, আপনেরা হুনতে হোনেন হোনা।" সেই যে ঢাকার লোকেরা বলে—আমরা বলার সময় তো 'সোনা-ই বলি, আপনারা শুনতে শোনেন 'হোনা'।

ঠাম্মা ছদ্ম রাগে "যা বান্দর পোলা" বলে নিজের ঘরে চলে গেলেন।

সকলের হাসি থামলে বাবা বললেন, "আর আমার ভাষা?"

"তোমার? তোমার ভাষা এমনিতে চলে যায়। কিন্তু তুমিও প্রচুর ভুলভাল বল। সেদিন কী একটা কথায় বললে 'ওব্যাহত'। ওটা অব্যাহত হবে। উলটোদিকে আর-একদিন বললে 'অ-ভ্যাস', যেটা আসলে হবে ওভ্যাস। তুমি বেক্তি না বলে বল 'ব্যাক্তি', প্যাখম না বলে বল পেখম।"

বাবা স্বীকার করলেন, "বুঝি, গণ্ডগোল হয়। কিন্তু কোন্‌টা ঠিক কে বলে দেবে?"

হিগিনকাকু হাঁটু চাপড়ে বললেন, "আমি বলব! স্ট্যান্ডার্ড ভাষা আছে না একটা, যাকে বাংলা বইয়ে বলে মান্য চলিত ভাষা? তার নিয়মকানুন আছে, সেগুলো বুঝে নিলেই হল।"

বাবা কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, এমন সময় মার কোলে তিন্নি গা—গা—গ্‌গা— ঙ—গা ইত্যাদি আওয়াজ আরম্ভ করে দিল। হিগিনকাকু সব্বাইকে শ্‌শ্‌শ্‌ করে ঠোঁটে আঙুলে দিয়ে চুপ করতে বলে, তার সামনে মাইক্রোফোন ধরে টেপ চালিয়ে দিলেন।

তারপর ফিসফিস-গলায় বাবাকে বললেন, "কোনো চিন্তা নেই, আমি ব্যবস্থা করছি—এই তিন্নি আর ভন্টু তোমাদের ভাষাটা দুরস্ত করে দেবে।"

তিন্নি বলল, "আ-গ্‌গা।" বোধ হয় বোঝাতে চাইল, "ঠিক বলেছ হিগিনকাকু!"

ভাষা নিয়ে ঠাট্টা নয়

খাওয়াদাওয়ার পর তিন্নির রেকর্ড বাজিয়ে শোনানো হল একটু, তিন্নিও অল্প একটু সময় জুলজুল করে তাকিয়ে শুনল। তারপর চোখ দুটি ঢুলে এল তার। মা তাকে শুইয়ে দিয়ে বাইরের, ঘরে ফিরে এসে বললেন, "আচ্ছা, তোমরা লোকদের ভাষা নিয়ে এত ঠাট্টা-ইয়ার্কি কর কেন বলো তো?"

বাবা বললেন, "সত্যি হিগিন, এ খুব অন্যায়।"

হিগিনকাকু ভন্টুর দিকে তাকালেন, ক্ষুণ্ণ গলায় বললেন, "দেখলি তো, কীরকম উটকো লাঞ্ছনা! শোনো বড়দা, বউদি শোনো, আমি ভাষাবিজ্ঞানী, কারও ভাষা নিয়ে আমি ঠাট্টা করি না। আমার শাস্ত্র ভাষার সাম্যবাদ মেনে নিয়েছে। আমরা বলি, সব ভাষা সমান, কোনো ভাষা অন্য কোনো ভাষার চেয়ে বড়ো বা ছোটো নয়। যার যা ভাষা, তার সে ভাষাই তার সব দরকার মেটাতে পারে।"

ভন্টুর মা দুষ্টুমি করে বললেন, "বাঃ তবে আমার ভাষা নিয়ে ভ্যাংচালে যে! আমি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে পড়েছি সে কি আমার দোষ!"

"মাইন গঠ্!" —এবারে জার্মান ভাষায় 'হা ঈশ্বর' বলে উঠলেন হিগিনকাকু। "আরে আমি তো তোমাদের কার কীরকম ভাষা তার নমুনা দিচ্ছিলাম!" তারপর ভন্টুকে বললেন, "মনে রাখবি, যে বৈজ্ঞানিক সে কখনও তার বিষয়কে নিয়ে

রসিকতা করে না। ভাষাবিজ্ঞানীও ভাষা নিয়ে ঠাট্টা করতে পারে না। শাস্ত্রে বারণ আছে।"

ভন্টু হতাশ হয়ে বলল, "আমিও পারব না কাকু? ধরো আমাদের ক্লাসের নিরঞ্জন ভৌমিক কথায়-কথায় স-স-স করে, তাকে সবাই স্যামবাজারের সসিবাবু বলে খ্যাপায়। আমিও তো খ্যাপাই।"

হিগিনকাকু ধমকে বললেন, "ফ্রম নাউ অন, অল খ্যাপানো মাস্ট স্টপ! মনে রাখবে, আজ থেকে তুমি বৈজ্ঞানিক, আর তুমি সাধারণ লোক নও। তোমার কাছে কোনো ভাষা হাসির নয়, লজ্জার নয়।"

বাবা বললেন, "সাধু সাধু! তবে আমরা সাধারণ লোকেরা কিন্তু খ্যাপাব, খেপব। এইমাত্র ভন্টু বলল স-স করে কথা বলার কথা। এর উলটো আছে। আমার কলিগ, এই পশ্চিমবঙ্গেরই এক মফস্‌সল-এলাকার লোক। বড়ো স্কলার ছিলেন, কিন্তু শ-শ করে কথা বলেন—শিনেমা দেখতে যাবে বাশে করে, না শাইকেলে শিগারেট খেতে-খেতে যাবে?"

হিগিনকাকু অধৈর্য হয়ে বললেন, "আরে ডায়ালেক্ট তো থাকবেই।"

"ডায়ালেক্ট কী কাকু?" ভন্টু এর মধ্যেই জিজ্ঞাসু ছাত্র হয়ে গেছে।

"ওই—বাংলায় যাকে বলে উপভাষা। একটা ভাষার নানারকম চেহারা আছে তো। প্রথমে ধর্‌, জায়গা অনুযায়ী—এক-এক জায়গায় এক-এক চেহারা। নদিয়াতে এই, সিলেটে এই, পুরুলিয়াতে এইরকম, আবার নোয়াখালিতে এইরকম। ব'লে নোয়াখালির বন্ধুর কাছে শোনা দীর্ঘ বাক্য আউড়ে গেলেন—"দইন্য খালীসরণ দইন্য, দইন্য তোমার অস্ত্রশিক্ষ্যা, দইন্য মাতৃদুগ্ধ ফান—খোফের উফর খোফ্‌, খোফের উপর খোফ্‌, দ্বাবিংশতি খোফে ফাডা না করিল ব্যা!" (ধন্য কালীচরণ ধন্য, ধন্য তোমার অস্ত্রশিক্ষা, ধন্য মাতৃদুগ্ধ পান—কোপের ওপর কোপ, কোপের ওপর কোপ—দ্বাবিংশতি কোপে পাঁঠা না করিল—'ব্যা'!) বলতে বলতেই হাই তুলে "ওফ্‌, খাওয়াটা বড্ড বেশি হয়ে গেছে" বলে সোফায় টানটান হয়ে পড়লেন এবং শুতে-না-শুতেই বিপুল আর্তনাদ করে তাঁর নাক ডাকতে লাগল।

বাবার ইঙ্গিতে ভন্টু একটা বালিশ এনে হিগিনকাকুর মাথার নিচে গুঁজে দিয়ে জিজ্ঞেস করল, "বাবা, নাকের ডাক কি একটা ডায়ালেক্ট?"

বাবা নীরব হাসি হেসে বললেন, "কাকু জেগে উঠলে তাঁর কাছেই জেনে নিয়ো সেটা।"

মিশিমাখা শিখিপাখা
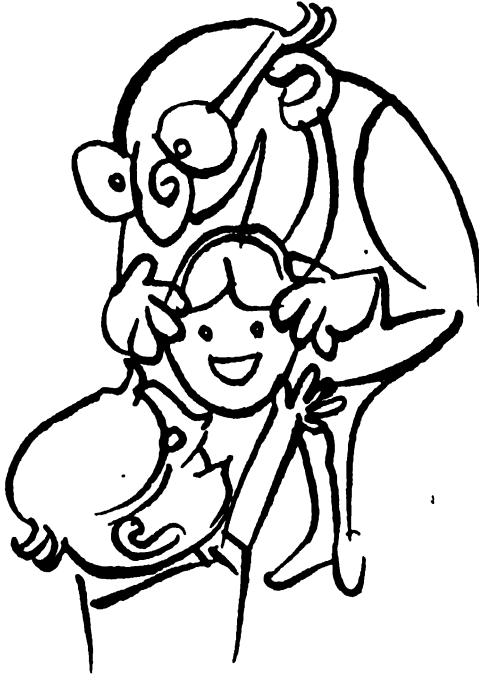
ভন্টু খেলতে বেরিয়ে গিয়েছিল, ফিরে এসে দেখে তিন্নির গলা এরই মধ্যে খানিকটা রেকর্ড করা হয়ে গেছে। হিগিনকাকু ক্যাসেট বাজিয়ে শুনছেন, আর একটা খাতায় কী সব লিখে রাখছেন। লেখার কয়েকটা ইংরেজি অক্ষর, আবার কিছু চিহ্ন ভন্টুর অচেনা। সে খানিকক্ষণ কান পেতে শুনল, কিন্তু 'আ-গ্ গা-আ-ঙ্গা-আ' ছাড়া আর প্রায় কিছুই নেই ক্যাসেটে। তা অত মন দিয়ে শোনার কী আছে? সে জিজ্ঞেস করল, "কাকু, এ তো কথাই নয়—এগুলো খামোকা রেকর্ড করলে কেন?"

হিগিনকাকু যেন ঠিক ধ্যান ভেঙে জেগে উঠলেন। বললেন, "হাঁ কর্ তো!"

ভন্টু বেশ ঘাবড়ে গেল। হিগিনকাকু লেখাপড়ায় ডক্টরেট বলে সে শুনেছে, কিন্তু রোগের ডাক্তার তো নয়, এ-কথা বলছে কেন? তাছাড়া হাঁ করতে ভন্টুর একটু অস্বস্তিও আছে। তার ওপর-পাটির মাঝখানের দুটো দাঁত একটু বড়সড়ো,

স্কুলের বন্ধুরা এ জন্যে তাকে 'খরগোশ' বলে খ্যাপায়। তার বাবারও ওই দুটো দাঁত বড় সাইজের, এজন্যে মা বলেন ভন্টু পৈতৃক সম্পত্তি পেয়েছে। যাই হোক, এখন হিগিনকাকু তার গুরু, কাজেই সে ভয়ে-ভয়ে হাঁ করল।

"এবার বল্, তোর মুখের মধ্যে তুই কী দেখছিস!"

"বাঃ," ভন্টু বলল, "আমার মুখ কি আমি দেখতে পাচ্ছি না কি?"

হিগিনকাকু নাটকীয় ভঙ্গিতে মাথা চাপড়ে বললেন, "ঠিক কথা! আসলে এখনও ঘুম ছাড়েনি আমার।" বলে, "বউদি, আর-এক কাপ কালো কফি" বলে হাঁক দিলেন, তারপর বললেন, "যা একটা ছোটো আয়না নিয়ে আয়।"

ভন্টু ঠাকুমার ঘর থেকে কাঠের ফ্রেমওয়ালা একটা হাত-আয়না নিয়ে এল। হিগিনকাকু ভন্টুর মুখের সামনে ধরলেন সেটা, তারপর বললেন, "এবার বল্ তো—

মিশিমাখা, শিখিপাখা আকাশের কানে কানে,

শিশিবোতল ছিপি-ঢাকা সরু সরু গানে গানে।"

সুবোধ ছাত্রের মতো কথাটা আউড়ে গিয়েই ভন্টু ফিক করে হেসে ফেলল। সঙ্গে-সঙ্গে মস্ত ধমক--"একদম হাসি নয় ভন্টু! এখন তুমি বৈজ্ঞানিক গবেষণা করছ! এবার কী দেখলে?" ভন্টু ভয়ে-ভয়ে বলল, "দেখলাম কথা বলছি, আর আমার মুখ নড়ছে।"

হিগিনকাকু যেন অবাক হলেন, "ব্যস, এই? মুখ নড়ছে? আর কিছু নয়? আচ্ছা শোন্, এবার ওই লাইনদুটোই আরেকবার বল্। এবার কিন্তু গলায় আওয়াজ করবি না।"

"আওয়াজ করব না মানে?"

"মানে লাইনদুটো বলে যাচ্ছিস তুই, সবই করছিস্, কিন্তু শুধু আওয়াজটাই হচ্ছে না। নে, বল্।"

হিগিনকাকু আবার আয়নাটা ভন্টুর মুখের সামনে তুলে ধরলেন।

'জিভ হচ্ছে গুরুদেব'

ভন্টু এবার আওয়াজটা চেপে রেখে আবার ওই মিশিমাখা শিখিপাখা করে গেল।
"এবার কী দেখলি?" হিগিনকাকু জিজ্ঞেস করলেন।

ভন্টুর মনে হচ্ছিল টিভি-র সিনেমা দেখতে-দেখতে হঠাৎ শব্দটা বন্ধ হয়েছে। তার ঠোঁটদুটো কখনও কানের দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে, কখনও তার হাঁ বড়ো হচ্ছে, কখনও ঠোঁটদুটো গোল হচ্ছে নানা সাইজে। আর মুখের ভেতর জিভটার সে কী দৌড়োদৌড়ি। ঠোঁট আর জিভের এই দমবন্ধ ব্যস্ততা দেখে ভন্টুর খুব হাসি পেল। হিগিনকাকুকে এ-কথা বলতে তিনি ডান হাতের একটা আঙুল কপালে ঠেকিয়ে বললেন, "তবু জিভ হচ্ছে গুরুদেব!"

আচ্ছা, এর কোনো মাথামুণ্ডু হয়? এই হিগিনকাকু তাকে দিয়ে খামোখা মিশিমাখা শিখিপাখা বলিয়ে নিলেন, তার ওপর একবার আওয়াজ না করে, আবার এখন বলছেন, "জিভ হচ্ছে গুরুদেব!" ভন্টু রেগে গেল এবার। বলল, "কী বলছ হিগিনকাকু? জিভকে গুরুদেব কে বানাল আবার?"

হিগিনবথাম বললেন, "বাস রে বাস, জিভের মহিমা তোকে কী বলব! জিভ মানেই ভাষা। জানিস তো, 'ভাষা' কথাটার ইংরেজি 'ল্যাঙ্গুয়েজ' কথাটা এসেছে

ল্যাটিন ভাষার 'লিঙ্গুয়া' থেকে? তার মানে জিভ। তাই পোর্তুগিজ 'লিঙ্গুয়া', স্প্যানিশ 'লেঙ্গুয়া'—দুই-ই বোঝায়—জিভ আর ভাষা। ইংরেজি 'টাং'-ও কি তাই নয়? 'মাদার টাং' মানে কি 'মার জিভ'? সংস্কৃত 'রসনা'? ফারসি 'জুবান' বা 'জবান'? সব কটার মানে 'জিভ' ও, আবার 'ভাষা'ও—বুঝলি? জিভ নেই তো ভাষাও নেই! জিভের নিন্দে করিস না, জিভ খসে যাবে!" বলে রাধার রেখে যাওয়া কালো কফিতে হিগিনকাকু সুড়ুত সুড়ুত করে চুমুক দিতে লাগলেন। আরামে তাঁর চোখ প্রায় বুজে এল।

এই সুযোগে ভন্টু ভাবল একটা ভেঙচি কেটে হিগিনকাকুকে বুঝিয়ে দেয় যে, কথা বলা ছাড়াও জিভের অন্য কাজ আছে।

হিগিনকাকু যেন মনে-মনে এই কথাটাই ভাবছিলেন। বিরাট আওয়াজ করে কফির তলানিটুকু শেষ করে বললেন, "তার মানে অবশ্য এই নয় যে, কথা বলার খবরদারি করাই জিভের একমাত্র কাজ। এমনকি জিভের আসল কাজও নয় সেটা। জিভের আসল কাজ হল খাবারের স্বাদ নেওয়া বুঝলি?" বলেই আরেকবার হাঁক পাড়লেন—"বউদি, সামনের রোববার আসছি ফের, সেদিন দু-চারটে চাইনিজ রান্না করবেন"—বলে জিভের জল টেনে নিয়ে ভন্টুকে জিজ্ঞেস করলেন, "সাইড বিজনেস কাকে বলে জানিস?"

ভন্টু ঘাড় নাড়ল। না, সে জানে না।

"এই ধর", হিগিনকাকু বোঝাতে লাগলেন—"আমি কলেজে পড়াই, মাইনে পাই। ওইটে আমার আসল কাজ। তার বাইরে আবার আমি এখানে-ওখানে ছুটকো-ছাটকা লিখি, টাকা পাই—ওইটে আমার সাইড বিজনেস। এই কথা-বলাটাও হল জিভ ঠোঁট অ্যান্ড কম্পানির সাইড বিজনেস।"

ভন্টু বলল, "বুঝতে পারছি না কাকু।"

আওয়াজ-রহস্য

"এই যে শ্বাস টানছি আমরা", হিগিনকাকু বুক ফুলিয়ে শুশুকের মতো দম নিলেন, "এটা ফুসফুসে যাচ্ছে জানিস তো? সেখানে হৃৎপিণ্ড রক্ত চালান করছে, আর এই নিশ্বাসের অক্সিজেন সে রক্ত সাফ করে দিচ্ছে।"

ভন্টু বলল, "ওসব তো স্বাস্থ্য-বইয়ের কথা!"

"আহা শোন্ না!" হিগিনকাকু বলে উঠলেন, "রক্ত সাফ হয়ে গেল, এখন ওই বাতাসটা কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্যাসে ভর্তি, নোংরা জিনিস। শরীর এখন সেটাকে বার করে দেবে, আবার নতুন করে শ্বাস নেবে।"

ভন্টু বলল, "ও কাকু, যে-বাতাসটা টেনে নিই সেটা কি প্রশ্বাস? আর যেটাকে ছেড়ে দিই সেটা নিশ্বাস?"

হিগিনকাকু চোখ জুলজুল করে জার্মান ভাষায় বললেন, "ট্সের গুট্—খুব ভালো! তবে কিনা ভন্টুবাবু, তুমি একটু বেশি স্মার্ট হয়ে পড়লে। সংস্কৃতে বা বাংলায় কথা দুটো একটু আলাদা করে ধরো, নিশ্বাসে শ্বাস-টানা শ্বাস-ছাড়া দুই-ই বোঝাতে পারে।"

"হলে কিন্তু বেশ হত, তাই না?" ভন্টু একটি 'নিশ্বাস' ছেড়ে বলল।

হিগিনকাকু এক বন্ধুর মুদ্রাদোষ নকল করে বললেন, "যাকগে যাকগে যাকগে যাক। আসল পয়েন্টে এসো। বাতিল নিশ্বাসের বাতাসের শরীর ফুসফুস বার করে দেবে। কোন্ পথে বেরুবে এখন সেটা?"

ভন্টু চটপট উত্তর দিল, "কেন কাকু, যে-পথ দিয়ে ঢুকেছিল, ওই শ্বাসনালী

দিয়ে?"

"উত্তম!" হিগিনকাকু খুশি হলেন খুব।

"এখন ওই যে শ্বাসনালী, ইংরেজিতে যার নাম ট্র্যাকিয়া ((trachea) ওটা তো একটা নলের মতো—মুখ আর ফুসফুসকে জুড়ছে। তাই তো?"

ভন্টু মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিল।

"ওই ট্র্যাকিয়ার ওপরের অংশটার নাম হল ল্যারিংস।" বলেই হিগিনকাকু হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, রোগা সিড়িঙ্গে লোকদের গলা লক্ষ করেছিস কি? কারও-কারও গলার ওপরদিকে একটা উঁচু ঢিবিমতন থাকে না, যেন চামচিকে গিলে ফেলেছে, কিন্তু সেটা গলায় আটকে আছে, এইরকম?"

ভন্টু এবার একটু রাগ করল। নিজে মোটাসোটা বলে হিগিনকাকুর রোগা লোকদের সম্বন্ধে এসব খারাপ-খারাপ কথা বলা কি উচিত হচ্ছে? সে-কথা বলায় হিগিনকাকু থমকে গেলেন তারপর স্প্যানিশ ভাষায় বললেন, "লো সিয়েন্তো! দুঃখিত! যা করেছি বিজ্ঞানের জন্যে, তোমাকে বোঝানোর জন্যে। আমার বাবাই তো ও-রকম ছিলেন ভন্টু, তুমি তাঁকে দ্যাখোনি! যা-হোক শোনো—"

ভন্টু এবার হেসে বলল, "বুঝেছি জিনিসটা। ওটাকে ইংরিজিতে কার আপেল না কী যেন বলে?"

"হ্যাঁ হ্যাঁ, আদমের আপেল, অ্যাডামস্ অ্যাপ্‌ল। বাংলায় ওই জায়গাটাই কণ্ঠা। শোন্, ওই কণ্ঠার ভেতরে দু পাশে লাগানো দুটো পর্দা আছে, যে-দুটো গুটিয়ে নালীর পথ পুরো খুলে দিতে পারে, আবার পর্দার মতো, বা দরজার পাল্লার মতো—দুদিক থেকে খুলে গিয়ে পথটা বন্ধ করে দিতে পারে। এ দুটোর নাম আগে ছিল স্বরতন্ত্রী বা ভোকাল কর্ড। এখন বলে 'ভোকাল ফোল্ডস'। বাংলায় বলতে পারিস ধ্বনিদ্বার। হারমোনিয়ামের রিড দেখেছিস?"

ভন্টু বলল, "হ্যাঁ, পাশের ফ্ল্যাটের সুমিদিদির হারমোনিয়াম খুলেছিল একদিন। ভেতরে সার-সার পেতলের পাত বসানো, বলল ওইগুলোই রিড, বেলো করে বাতাস ঢোকালে ওইগুলোতেই নাকি আওয়াজ হয়। আমি তো আগে ভাবতাম ওপরের সাদা-কালো চাবিগুলোই বুঝি রিড!"

হিগিনকাকু হেসে বললেন, "না-না। এখন শোন্, আমাদের ওই দুটো ধ্বনিদ্বার দুটো রিডের মতো। খানিকটা খুলে বাতাস দিয়ে ঠেলা দিলেই ও দুটো কাঁপবে, আর কাঁপলেই আওয়াজ হবে। শোন্ দুটো আঙুলে তোর কণ্ঠাটা জোরে চেপে ধরে বল্ 'আ'—"

ভন্টু আওয়াজটা করতে-করতে দেখল কণ্ঠটা রিনরিন করে কাঁপছে, বুঝল আসলে ধ্বনিদ্বার দুটো কাঁপছে।

হিগিনকাকু টেবিল চাপড়ে বললেন, "এই হল গলার আওয়াজের রহস্য!"

আয়নার সামনে কথা

ভন্টু কী যেন ভাবল একটু। তারপর জিজ্ঞেস করল, "আচ্ছা কাকু, গলার আওয়াজের রহস্য না-হয় বুঝলাম, কিন্তু কথা হয় কী করে? শুধু আ-আ-আ আওয়াজ করলে তো কথা হয় না!"

"ব্রিলিয়ান্ট!" খুব খুশি হয়ে জুলজুল করে ভন্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন হিগিন। "তোমাকে শিষ্য হিসেবে পেয়ে আমি গর্বিত।" বলে আদর করে ভন্টুর মাথার চুল এলোমেলো করে দিলেন, তারপর হাসিমুখে বললেন, "ঠিক কথা! ধ্বনিদ্বারের কাজ হল আওয়াজ করা, গলাটাকে বাজানো—বাঁশি যেমন করে বাজায়। আর জিভ আর ঠোঁটের কাজ হচ্ছে ওই আওয়াজকে কথার চেহারা দেওয়া। বাঁশির ফুটোগুলো নানারকম করে টিপে যেমন নানারকম সুর বার করতে হয়, তেমনি কথাও বার হয় জিভ আর ঠোঁটের কারিগরিতে। তাঁর মধ্যে আবার জিভের কাজই বেশি।"

"তা এরা করে কী?"

এবার হিগিনকাকু যেন রেগে উঠলেন একটু। বললেন, "আরে পোলাপান, কথাটা আমাকে জিজ্ঞেস করার কী আছে? তুমি নিজেই দিব্যি কথা বলতে পার। একটু কথা বলো, বলে বুঝে নাও জিভ আর ঠোঁট কী করছে। আয়নাটা আবার মুখের সামনে ধরো, আর ভাবতে থাকো ঘটনাটা কী ঘটছে?"

ভন্টুর সংকোচ একটু কমেছে। সে আয়নাটা মুখের সামনে ধরে বিড়বিড়

করে বলতে লাগল, "ঘটনা কী ঘটছে! বলো তো বাপু আয়না!"

হিগিনকাকু গম্ভীর স্বরে বললেন, "তা আয়না কী বলছে!"

ভন্টু বলল, "আয়না বলছে, এই দেখুন ভন্টুবাবু, আপনার জিভের নানা জায়গা মুখের ছাদে ঠেকছে, বাতাস বেরোবার রাস্তা বন্ধ করছে ছাড়ছে। শেষদিকে ঠোঁটদুটোও বন্ধ হচ্ছে।"

হিগিন বললেন, "ঠিক। আয়না অতি সত্যবাদী! ওই হল কথার আওয়াজের রহস্য। গলার ধ্বনিদ্বার থেকে আওয়াজ বয়ে বাতাস আসছে মুখে। এবার জিভ তাকে আটকে দিচ্ছে, ছাড়ছে, ঠোঁট তাকে আটকে দিচ্ছে, ছাড়ছে। ঠোঁট আটকে ছেড়ে দিলে একধরনের আওয়াজ, জিভ আটকে ছেড়ে দিলে আরেকরকমের আওয়াজ। যখন আটকে দিচ্ছে তখন কিন্তু আওয়াজ নেই, ছাড়লেই আওয়াজ শুনতে পাই। আটকানোর এক-একটা জায়গা ওই বাঁশির এক-একটা ফুটোর মতন।" হঠাৎ হিগিনকাকু খুব আবেগ দিয়ে একটা ছড়া আউড়ে গেলেন।

"অ-আ-ই উ
চিল্লাতা হ্যয় কি উঁ?"
জিভ ভেঙচে এ-ও
বলল, "কলা খেয়ো।"

তারপর তিনি ভন্টুকে বললেন, "আচ্ছা বাছাধন, এবার বলো তো, ওই যে আমি অ-আ-ই-উ আর এ-ও বললাম, ওখানে মুখের রাস্তাটা কে আটকাচ্ছে?"

ভন্টু বলল, "ও, আমাকে ঠকানো হচ্ছে! কেউ তো আটকাচ্ছে না—আওয়াজ সোজা বেরিয়ে আসছে!"

হিগিনকাকু বললেন, "তো তোর ঠোঁট আর জিভ করছেটা কী? নাম্বা হয়ে লিদ্রা দিচ্ছে?"

ভন্টু লজ্জিত হয়ে আবার আয়নাটা ধরল মুখের সামনে। আগের মতোই দেখল, অ-আ ইত্যাদি বলবার সময় ঠোঁট কখনো নানা সাইজে গোল চেহারা নিচ্ছে, আবার কখনো দুপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। আর জিভও ভেতরে বেশ ব্যস্ত। কিন্তু মুখের পথ পুরো আটকাচ্ছে না কোথাও।

"মানে তোমার হল গিয়ে ওর নাম কী, ওই আওয়াজটা যদি মুখের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসার পরিষ্কার পথ পায়, কোথাও না ঠেকে তাহলে তুমি সেই জিনিস উচ্চারণ করতে পারবে যার নাম স্বরধ্বনি। ইংরেজিতে ভাওয়েল (vowel)—কিন্তু এর 'ভ'-টা বাংলা 'ভ' নয় মনে রাখিস। ওই স্বরধ্বনি—"

ভন্টু থামিয়ে বলল, "স্বরবর্ণ বলো! আমরা তো তাই পড়েছি!" হিগিনকাকু অধৈর্য হলেন একটু, "আরে শাখামৃগ, স্বরবর্ণ হল লেখার যে-চেহারা। মুখের আওয়াজটা হল ধ্বনি। আওয়াজটা স্বরধ্বনি, লেখার অক্ষরটা স্বরবর্ণ।"

তারা সাতজন
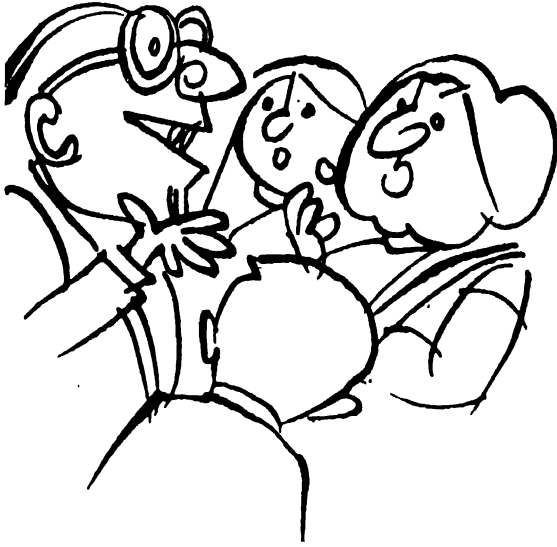
ভন্টু জিজ্ঞেস করল, "কিন্তু ঠোঁট আর জিভ স্বরবর্ণের, না-না, স্বরধ্বনির বেলায় করছে কী তাহলে?"

হিগিনকাকু বললেন, "সুরের আসল খেলা ওরাই খেলছে। এই ধর্, আমাদের স্ট্যান্ডার্ড অর্থাৎ মান্য চলিত বাংলায়—মূলত সাতটা স্বরধ্বনি আমরা ব্যবহার করি—ই উ এ ও অ্যা আ অ।"

ভন্টু বাধা দিয়ে বলে উঠল, "সে কী! আমরা যে পড়েছি বারোটা স্বরবর্ণ!"

"আবার তুমি স্বরধ্বনি আর স্বরবর্ণ গুলিয়ে ফেলছ?" একটু ধমকে উঠলেন হিগিনকাকু এবার। "শোনো, কথাটা খেয়াল করো, মুখের কথায় আমরা বারো রকমের স্বরধ্বনি উচ্চারণ করি না, সাতটাতেই সাধারণ কাজ চলে যায়।"

ভন্টু বলল, "হারমোনিয়ামের সাতটা সুরের মতো, তাই না?"

হিগিনকাকু উচ্ছ্বাসে লাফিয়ে উঠে উর্দুভাষায় "কেয়া খুব" "কেয়া খুব" বলে উঠলেন। তারপর বললেন—"এই 'খুব' মানে 'সুন্দর' ; কথাটার 'খ'-এর উচ্চারণ লক্ষ করো, উর্দু 'খে' অক্ষরের উচ্চারণ"—বলে তিনি গলা খাঁকারির মতো আওয়াজ করতে লাগলেন। ভন্টুর মনে হল এ-আওয়াজটা যেন সে কোথায় শুনেছে। কিন্তু কোথায়? তার প্রশ্নের উত্তর পাওয়া গেল পরমুহূর্তেই, যখন ঠাম্মা

হঠাৎ দরজায় মুখ বাড়িয়ে বললেন, "কী রে নানু, তর গলায় মাসের কাটা ফুটসে নাকি? কই, খাওনের হময় ত কস নাই কিসু?"

ঠাকুমার পেছনে-পেছনে রাধা এসে দাঁড়িয়েছিল, সে ফিসফিস করে বলল, 'ভন্টুবাবা, মেইদাকে (মেজদাকে) বলো, বেড়ালের পায়ে ধইরতে, তাহলে কাঁটা নেইবে যাবে।"

এইবার ভন্টুর মনে পড়ল যে গলায় মাছের কাঁটা ফুটলে গলা 'ঝাড়বার' আওয়াজটাই ওই 'খ'-এর আওয়াজ। কিন্তু তার চিন্তা ছটকে দিয়ে হিগিনকাকু মার্কিনিদের মতো হাল ছেড়ে দেওয়ার গলায় বলে উঠলেন, "ওহ্ বয়, ওহ্ বয়! মামিমা, রাধা, দুজনেই কেটে পড়ো, কিস্যু হয়নি আমার।" ওরা চলে গেলে "যত্তো সব!" বলে বিরক্তমুখে দরজার দিকে তাকিয়ে রইলেন সেকেন্ড-সাতেক, তারপর বললেন, "হচ্ছিল ভাষাবিজ্ঞান, হঠাৎ এসে বলে কিনা বেড়ালের পায়ে ধরতে হবে! হ্যাঁ, কোথায় যেন ছিলাম, হ্যাঁ, ওই সাতটা স্বরধ্বনি। **সাতটা স্বরধ্বনি সাতরকম কেন হচ্ছে? তার কারণ প্রত্যেকটা স্বর উচ্চারণের সময় জিভ যে জায়গায় থাকছে আর ঠোঁট যে-চেহারা নিচ্ছে—প্রত্যেকটা আলাদা-আলাদা।** ধরো ই উচ্চারণের সময় ঠোঁট বেশ ছড়িয়ে থাকছে আর জিভের আগার দিকটা বেশ ওপরে উঠে সামনে এগিয়ে থাকছে—" বলতে-বলতে হিগিনকাকু হঠাৎ একটু মুচকি হাসি হেসে বললেন, "জানিস তো ভন্টু, ইংল্যান্ডে আমেরিকায় যখন ফোটোগ্রাফাররা হাসিমুখের ছবি তুলতে চায় তখন তারা লোকেদের বলে— 'সে চী-ই-জ!' মানে 'চীজ' কথাটা বলো।"

ভন্টু অবাক হয়ে বলল, "কেন কাকু? 'চীজ' বললে হাসির কী সুবিধে হবে?"

"আরে বালক, বুঝলি না, 'চীজ'-এর ওই ই-ই অর্থাৎ লম্বা ই ধ্বনিটি টেনে বলতে গেলেই ঠোঁট দুপাশে ছড়িয়ে গিয়ে মুখখানা হাসি-হাসি হয়ে যাবে, ব্যস, ক্যামেরাও তক্ষুনি ক্লিক করবে। অর্থাৎ, 'ই' বলার সময় ঠোঁটের চেহারা কী হচ্ছে তা বোঝা যাচ্ছে—ওই হাসিমুখের মতো।"

ভন্টু বলল, "কিন্তু তুমি বলছ, ঠোঁটের সঙ্গে জিভও কাজ করে যাচ্ছে!"

হিগিনকাকু বললেন, "ইয়াপ্! ঠোঁট যেমন কখনও গোল হচ্ছে কখনও ছড়িয়ে যাচ্ছে, জিভও তেমনি ওপরে উঠছে, নীচে নামছে, সেইসঙ্গে সামনে এগোচ্ছে বা পেছনে পিছোচ্ছে। কোন্ স্বরের বেলায় ঠোঁট আর জিভের কাজকম্মো ঠিক কী দাঁড়াচ্ছে সেটা এবার শোনো।"

জিভ ও ঠোঁটের নৃত্যনাট্য

"স্বরধ্বনি উচ্চারণের বেলায় তাহলে তিনটে জিনিস একসঙ্গে ঘটছে," হিগিনকাকু তর্জনী তুলে বলে চললেন, "এক, ধ্বনিদ্বার কাঁপিয়ে হাওয়া আওয়াজ বয়ে আনছে, দুই, জিভ নানারকম 'পজিশন' নিচ্ছে, আর তিন নম্বর, দুটো ঠোঁট মিলে হয় গোল হচ্ছে নানারকম সাইজে, না-হয় দুপাশে ছড়িয়ে যাচ্ছে। তুই নৃত্যনাট্য দেখেছিস?"

ভন্টু জানাল সে রবীন্দ্রনাথের 'চণ্ডালিকা', 'চিত্রাঙ্গদা' এইসব দেখেছে।

হিগিনকাকু বললেন, "তাহলে জিনিসটা এইভাবে দ্যাখ্। গলার ওই আওয়াজটা যেন গান। আর ওই গানের সঙ্গে-সঙ্গে জিভ আর ঠোঁট দুয়ে মিলে নানারকম 'পোজ' দিচ্ছে। এক-একটা স্বরধ্বনির জন্যে দুজনের এক-একরকমের 'পোজ'। ব্যালেতে একেই বলে 'পা দ দো' (Pas de deux) বা 'যুগল পদক্ষেপ'। যুগলবন্দিও বলতে পারো।

ভন্টু জিজ্ঞেস করল, "তার মানে হল, স্বরধ্বনি আলাদা হলে জিভ আর ঠোঁটের পোজও আলাদা হবে?"

"এক্কেবারে শতকরা দুশো ভাগ ঠিক বলেছ।" খুব খুশি হলেন হিগিনকাকু, "এবার শোনো,—কোন্ স্বরধ্বনির বেলায় নায়ক-নায়িকা অর্থাৎ জিভ আর ঠোঁটের কী পোজ দাঁড়াচ্ছে।"

ভন্টু 'বলো' বলাতে হঠাৎ চটে উঠলেন আবার। "বলো মানে কী, অ্যাঁ?" আমি বলব, আর তুমি বুঝে যাবে? যা, একটা খাতা নিয়ে আয়! লিখে দিচ্ছি—পরে বারবার দেখে শিখে রাখবি ব্যাপারটা!"

ভন্টু একটা খাতা নিয়ে এল। হিগিনকাকু বলতে লাগলেন—

ই বলছি, ঠোঁট দু-কানের দিকে ছড়িয়ে যাচ্ছে আর জিভের আগা বেশ উঁচু হয়ে সামনে এগিয়ে যাচ্ছে। (কিন্তু হিগিনকাকু খাতায় লিখলেন ই=[+ঊর্ধ্ব,+সম্মুখ,+ছড়ানো])।

উ বলছি, ঠোঁট সরুমতন গোল হচ্ছে, জিভ পিছন দিকটা বেশ উঁচু করে পিছিয়ে যাচ্ছে, প্রায় আলজিভের গোড়া ছুঁইছুঁই। (লিখলেন উ=[+ঊর্ধ্ব, +পশ্চাৎ, +গোল])।

এ : ঠোঁট ফাঁক করে ছড়ানো, জিভ মাঝামাঝি উঁচু হয়ে সামনে এগুচ্ছে। এ=[+উচ্চমধ্য, +সম্মুখ, +ছড়ানো]।

ও : ঠোঁট একটু বড়সড়ো গোল, জিভ পিছিয়ে মাঝামাঝি উঁচু হচ্ছে (ও=[+উচ্চমধ্য, +পশ্চাৎ, +গোল])।

অ্যা : ঠোঁট বেশ খোলা, তবে ছড়ানো ; জিভ খুব অল্প উঠে একটু এগিয়ে যাচ্ছে। (অ্যা=[+নিম্নমধ্য,+সম্মুখ,+ছড়ানো])।

অ : ঠোঁট বেশ বড় গোল, জিভ অল্প উঁচু হচ্ছে কিন্তু পিছোচ্ছে। (অ=[+নিম্নমধ্য, +পশ্চাৎ, +গোল])।

আ : মুখের বিরাট হাঁ ; জিভ না উঠছে, না এগোচ্ছে, না পিছোচ্ছে। (আ=[+নিম্ন+কেন্দ্রীয়])।

খাতটা ভন্টুকে ছুঁড়ে দিয়ে হিগিনকাকু বললেন, "বাই- বাই! পরের দিন বুঝিয়ে দেব নৃত্যনাট্যের চিত্রনাট্য।"

স্বপ্নমঙ্গল

খাতায় যা লেখা ছিল, তা দেখে ভন্টু প্রথমে কিছুই বুঝতে পারল না। দেখতে খানিকটা 'সরল' অঙ্কের মতো কিন্তু সংখ্যার জায়গায় আছে কথা—কাজেই সব 'যোগ' হলেও আসলে খুব জটিল অঙ্ক যেন। খাতায় এই লেখা ছিল—

ই=[+ উর্ধ্ব, + সম্মুখ, + ছড়ানো]

উ=[+ উর্ধ্ব, + পশ্চাৎ, + গোল]

এ=[+ উচ্চমধ্য, + সম্মুখ, + ছড়ানো]

ও=[+ উচ্চমধ্য, + পশ্চাৎ, + গোল]

অ্যা=[+ নিম্নমধ্য, + সম্মুখ, + ছড়ানো]

অ=[+ নিম্নমধ্য, + পশ্চাৎ, + গোল]

আ=[+ নিম্ন, + কেন্দ্রীয়]

রাত হয়ে এসেছে, খাতার দিকে তাকিয়ে ভন্টুর খুব ঘুম পেতে লাগল। শেষে কোলে খাতা রেখে একসময় ঘুমিয়েই পড়ল সে। ঠাম্মা এসে কখন তুলে নিয়ে ঘুমের মধ্যে খাইয়ে দিলেন, কখন ঘুমের মধ্যে মশারির তলায় ঢুকে পড়ল, কিছুই ভন্টুর খেয়াল নেই। ভাগ্যিস স্কুলের হোমটাস্কগুলো কাল করে রেখেছিল, তাই

বাবা আর জাগিয়ে তুলে তাকে পড়তে বসাননি।

মধ্যরাত্রে হঠাৎ 'হাউমাউ' করে চেঁচিয়ে উঠল ভন্টু। বাবা-মা সক্কলে জেগে উঠলেন। বাবা কাঁধ ধরে ঝাঁকিয়ে জাগিয়ে দিলেন তাকে, জিজ্ঞেস করলেন, "কী হল রে? ভয়ের স্বপ্ন দেখেছিস কোনো? চিৎকার করলি কেন?" ভন্টু খানিকক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল, তারপর আস্তে আস্তে মাথা নেড়ে জানাল—না, ভয়টয় পায়নি। বাবা বললেন, "যা, জল খেয়ে এসে শুয়ে পড়!" ভন্টু ছোটো টেবিলে রাখা গ্লাস থেকে জল খেয়ে এসে শুয়ে পড়ল, কিন্তু তক্ষুনি ঘুম এল না তার। একটু হাসিও পেতে লাগল ভেতরে ভেতরে। সে তো আর বাবাকে বলতে পারে না যে, সত্যি একটা ভয়ংকর বিদ্‌ঘুটে স্বপ্ন দেখেছে সে। একটা চড়াইপাখির মতো সে যেন বিরাট একটা মানুষের মুখের মধ্যে ঢুকে পড়েছে, আর একটা দৈত্যের মতো বিশাল জিভ তাকে তাড়া করেছে। জিভটার গোড়া আটকানো থাকলে কী হবে, বিরাট বিরাট ছোঁ মেরে সে ভন্টুকে ধরবার চেষ্টা করছে—কখনও সামনে উঁচু হয়ে উঠে, কখনও পেছনে ঠেলে, কখনো আবার আগাটা উলটে। ভন্টু মুখের দরজা দিয়ে যেই বেরুবার চেষ্টা করছে ততই ঠোঁট দুটোর সাইজ বদলে যাচ্ছে, আর সে ফাঁকা রাস্তা দিয়ে বেরুতে পারছে না। আর আকাশ ফাটিয়ে পৃথিবী কাঁপিয়ে আওয়াজ হচ্ছে 'ই-ই-ই', 'উ-উ-উ', 'আ-আ-আ'। এখন হাসি পাচ্ছে, কিন্তু তখন ভন্টুর প্রাণ উড়ে যাবার অবস্থা। বাবাকে বললে বাবা নিশ্চয়ই বলবেন, "থাক, আর তোমার ভাষাবিজ্ঞানে কাজ নেই!"

তবে এই স্বপ্নে একটা জিনিস হঠাৎ ভন্টুর কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। তা ওই কথাগুলোর মানে। ভন্টু বুঝতে পারল, যোগচিহ্ন দেওয়া প্রথম দুটো কথা আসলে জিভের 'পোজ' বোঝাচ্ছে, আর শেষ কথাটাতে বোঝাচ্ছে ঠোঁটের 'পোজ'। এক-একটা স্বরধ্বনিতে জিভ আর ঠোঁট মিলে ওইরকম অবস্থায় থাকে। পরের রোববার হিগিনকাকুকে কথাটা বলতেই তিনি পকেট থেকে একটা চকোলেট বের করে বললেন, "লহ এই পুরস্কার! তবে আরও কথা আছে।"

ছবিতে স্বরধ্বনির অঙ্ক

হিগিনকাকু বললেন, "কথাটা হল, একটা স্বরধ্বনিকে বোঝানোর জন্যে অত কথা খরচ করব কেন? ধরো তোমার নাম ভন্টু। এখন কারও সঙ্গে তোমার আলাপ করিয়ে দিতে গেলে আমি কি বলব যে, 'ইনি শ্রীমান ভন্টু, ইনি একটি মানবশিশু? কিংবা ইনি একটি প্রাণীবিশেষ?' আরে নামটাই তো বলে দিচ্ছে তুমি কী! জ্যান্ত মানুষ, না টেবিল-চেয়ার। টেবিল-চেয়ারের কি ভন্টু নাম হয়?"

ভন্টু বলল, "তা স্বরধ্বনিগুলোকে আরও কম কথায় কী করে বোঝাবে?"

"এক নম্বর, ঠোঁট কী করছে, তার হিসেব রাখার কিচ্ছু দরকার নেই বাংলা স্বরধ্বনির বেলায়। শুধু জিভের কাজ দেখো।"

ভন্টু বলল, "তা হলে জিভের কাজ অনুযায়ী ওই ওপরে, নীচে মধ্যে সামনে পেছনে, এইভাবে স্বরধ্বনির ভাগ করতে হবে তো?"

"ইগজ্যাক্‌টলি! সোনা ছেলে!" বলে মুগ্ধ চোখে খানিকক্ষণ ভন্টুর দিকে তাকিয়ে রইলেন হিগিনকাকু। তারপর বললেন, "কিন্তু আমরা তো 'প্লাস-মাইনাস' চিহ্ন ব্যবহার করছি।"

ভন্টু বলল, "বড্ডো অঙ্কের মতো হয়ে যাচ্ছে।"

"যাঃ, যোগবিয়োগ আবার একটা অঙ্ক নাকি?" হিগিনকাকু মৃদু ধমকে দিলেন। "এবার বলো তাহলে 'ই-টা' কী ধরনের স্বরধ্বনি।"

ভন্টু খাতা সামনে ধরে বলল, "+ওপরে, +সামনে?"

"ঠিক! কিন্তু একটু সাধুভাষায় ভদ্রলোকের মতো বল্ বাবা!"

ভন্টু বলে গেল, " 'ই'-টা হল +ঊর্ধ্ব,+সম্মুখ; 'উ' হল +ঊর্ধ্ব +পশ্চাৎ ; 'অ্যা' +নিম্নমধ্য, +সম্মুখ; 'অ' +নিম্নমধ্য, +পশ্চাৎ; 'এ' +উচ্চমধ্য, +সম্মুখ; 'আর—ও' +উচ্চমধ্য, +পশ্চাৎ। "আচ্ছা কাকু," ভন্টু জিজ্ঞেস করল, " 'উচ্চমধ্য' 'নিম্নমধ্য' মানে কী?"

"আরে গোবর্ধন, তাও জান না? 'উচ্চমধ্য' মানে এর উচ্চারণে জিভ মাঝামাঝি, কিন্তু ওপরের দিকে থাকে ; আর 'নিম্নমধ্য' হল যার উচ্চারণে জিভ মাঝামাঝি হলেও নীচের দিকে থাকে। বুইচিস্ বাপধন?"

ভন্টু বলল, "তার মানে 'মাঝামাঝি'-রও দুটো ধাপ—ওপরে আর নীচে : তাই তো?"
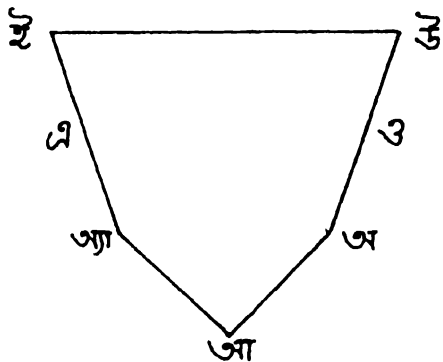
"একশোবার! আর বাকি রইল 'আ'। সেটা কী হবে?"

ভন্টু ভাবতে লাগল। 'আ'-র বেলায় জিভ এগুচ্ছে না, পিছোচ্ছে না, উঠছে না। "তাহলে কি আ-টা হবে +নিম্ন,-সম্মুখ,-পশ্চাৎ?"

"অর্জুনের লক্ষ্যভেদ" বলে লাফিয়ে উঠলেন হিগিনকাকু। তারপর খাতায় বাঁ পাশের এই ছবিটা এঁকে বললেন, "ধরো!"

ভন্টু জিজ্ঞেস করল, "এটা?"

"এতে তুমি স্বরধ্বনিগুলোর যা হিসেব দিলে সেটা ছবিতে ধরা আছে। বাঁ দিকটা 'সম্মুখ' আর ডানদিকটা 'পশ্চাৎ'। 'ওপরে' 'নীচে' তো দেখতেই পাচ্ছ। এই ছবিটা বুকের ভেতরে বসিয়ে নাও, হনুমান যেমন রামসীতার ছবি রেখেছিল। সামনে বার থেকে উচ্চারণের খেলা শুরু হবে।"

অজগর আসছে তেড়ে

তিন্নির আরও খানিকটা কথাবার্তা সকালে রেকর্ড করলেন হিগিনকাকু। ওই বেশির ভাগই 'দাদ্-দা, আ-দ্দা গাগ্-গা' আওয়াজ। ভন্টুকে আজ হিগিনকাকু টেপরেকর্ডার চালাতে আর রেকর্ড করতে শিখিয়ে দিয়েছেন, এতে তার মনে দারুণ আনন্দ। বাবা সাত-সকালে বাজারে বেরিয়ে গিয়েছিলেন। ভাই হিগিনবথাম চাইনিজ খেতে চেয়েছেন বলে পার্কসার্কাসের বাজার থেকে পর্ক (শুয়োরের মাংস), গড়িয়াহাট থেকে কচি বাঁশের অঙ্কুর, সিমলাই মির্চ বা ক্যাপসিকাম ইত্যাদি সব বাজার করে গলদঘর্ম হয়ে ফিরলেন। তারপর চানটান করে একেবারে ফরসা পাজামা-পাঞ্জাবি পরে বসবার ঘরে চলে এলেন। হিগিনকাকু তখন ভন্টুকে বোঝাচ্ছেন, বাংলায় সাতটা স্বরধ্বনি, কিন্তু তিন্নির তা শিখতে অন্তত দু-বছর

লাগবে। প্রথম দিকে পৃথিবীর সমস্ত শিশুরাই 'আ' স্বরধ্বনিটা মাত্র বলতে পারে।

"কেন কাকু?" ভন্টু একটু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"তার একটা বড়ো কারণ", হিগিনকাকু বলতে লাগলেন, 'আ' বলতে পরিশ্রম সবচেয়ে কম। জিভের পরিশ্রমের হিসেবটাই দ্যাখ-না। অন্য সব স্বরধ্বনির বেলায় তাকে যে-দিকেই হোক, একটু নড়াচড়া করতে হচ্ছে। কিন্তু 'আ' বলবার সময় সে সামনে এগোচ্ছে না, পেছনে পিছোচ্ছে না, ওপরে উঠছে না। মুখটা শুধু হাঁ করতে হচ্ছে। সে তো কান্নার সময়েই শিশুর বেশ হাঁ করা প্র্যাকটিস করা হয়ে যায়।"

বাবা হঠাৎ বাধা দিলেন। বললেন, "হিগিন, সেদিন তুই আমার উচ্চারণের ভুল ধরছিলি, বলছিলি আমি 'ওভ্যাস' না বলে 'অভ্যাস' বলি, আবার 'অব্যাহত' না বলে বলি 'ওব্যাহত'। গণ্ডগোলটা হচ্ছে 'অ' নিয়ে। বানানে 'অ' আছে কিন্তু উচ্চারণে কোথাও কোথাও হচ্ছে, 'ও', তাই তো।"

হিগিনকাকু বললেন, "এই বানানে 'অ' কোথায় হচ্ছে সে-বিষয়ে একটু খেয়াল রেখো। কোথাও 'অ' তো পরিষ্কার দেখাই যাচ্ছে, যেমন 'অত', 'অব্যাহত', 'অশনি'। আবার কোথাও 'অ' বর্ণটা চেহারা দেখাচ্ছে না, কিন্তু উচ্চারণে 'অ' আছে—যেমন সম্ভব। এটা আসলে—

স্+অ+ম্+ভ্+অ+ব্

ভন্টু বলল, "বাংলা অ, উচ্চারণে আছে, অথচ বানানে নেই কেন?"

হিগিনকাকু বললেন, "সে অনেক কথা। তবে লিখতে গেলে কী সুবিধে হয় সেটাও লক্ষ করো। একটা চিহ্ন লিখছি 'স' কিন্তু সেটা বোঝাচ্ছে 'স্+অ'। 'অ' লেখার পরিশ্রমটা বেঁচে যাচ্ছে।"

বাবা বললেন, "হ্যাঁ, খণ্ড-ত, অনুস্বার ইত্যাদি ছাড়া আর যে-কোনো ব্যঞ্জনবর্ণ লিখলেই বোঝাবে তার সঙ্গে 'অ' আছে। 'খ' যেমন 'খ্+অ' তাই না?"

"হ্যাঁ, সেই জন্যেই 'অ'-এর নাম 'ইনহেরেনট্ ভাওয়েল' বা 'নিহিত স্বর'।

"কিন্তু এই 'অ'-কে নিয়েই তো খুব ঝামেলা।" বাবা বলে উঠলেন। "ধরো আমি বাংলা জানি না। বানান দেখে উচ্চারণে কোথায় 'অ' হবে, কোথায় হবে 'ও', তা কী করে বুঝব?"

"আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। কী বলিস ভন্টু, তাহলে 'অ' দিয়েই আমাদের উচ্চারণের খেলা শুরু হোক, কেমন?"

ভন্টু উৎসাহে ঘাড় নেড়ে জানাল, ঠিক হ্যায়।

এখানেও রবীন্দ্রনাথ!

"হাপনারা সোব সোমোয় হামার বাংলা লিয়ে ঠাট্টা কোরেন কেন বোলেন তো, এ ভন্টুবাবু!" হিগিনকাকু হঠাৎ যেন হিন্দিভাষী লোক হয়ে গেলেন। সেইরকমই ভাঙা-ভাঙা বাংলায় বলে উঠলেন কথাটা। পরমুহূর্তেই আবার বাঙালি হয়ে ভন্টুর বাবাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা বড়দা, ধরো একজন হিন্দিভাষী ভদ্রলোক এই কথাটা তোমাকে জিজ্ঞেস করলেন। তুমি তাঁকে কী বলবে?"

বাবা একটু হেসে বললেন, "বলব, কেন ঠাট্টা করি আবার, আপনি যা বলেন তা বাংলা নয় বলে!"

"কেন, ও-কথাটা বাংলা হল না কেন?"

এবার ভন্টু কথা বলল, "কেন, ওই যে বলছেন 'হাপনারা'! বলছেন 'সোব' 'কোরেন' 'বোলেন'! ওগুলো বাংলা নাকি?"

হিগিনকাকু বললেন, "ঠিক, ওগুলো বাংলা নয়। বাংলা না-হওয়ার একাধিক কারণের মধ্যে একটা হল ওই 'ও' লাগানো—'সব' না-বলে 'সোব' (এখানে

আবার স্যামবাজারের সসিবাবুর স-টা এসে যায়,) 'করেন' 'বলেন' না-বলে 'কোরেন', 'বোলেন'।

বাবা বললেন, "তা উনি বাঙালি নন, এ-ভুল হতেই পারে। আমরাও হিন্দি বলতে অনেকেই বেশ ভুলভাল করি।" বলে কী একটা মনে পড়ে গেল তাঁর, আপনমনে একটু হেসে নিলেন। "বুঝলি হিগিন, আমার মোটা মেসোমশাই একবার বাজার করে রিকশায় উঠতে গিয়ে পা ফসকে ধড়মড় করে পড়ে গিয়েছিলেন। লাগেনি, তাই রিকশওলাটা হাসছিল। মেসোমশায় তিরিক্ষি হয়ে ধমকে বললেন, 'খাড়াকে খাড়াকে দাঁত নিকালকে হাসতা কাহে রে?' তা আমার কথা হল অন্য ভাষার লোক অ-এর জায়গায় ও তো বলবেই, সে তো আমার ভাষাটা তেমন করে জানেই না। কিন্তু আমার মাস্টারমশাই যখন কলেজে বলতেন, 'আহা! রবীন্দ্রনাথের চোণ্ডালিকা নৃত্যনাট্যখানা কী ওপূর্ব! আর রোক্তোকোরোবী নাটক! সেও কি কোম ওদ্ভুত!' তখন ভাবতাম, এঁরা তো বাঙালিই। তবু এ-ভুল করছেন কেন?"

হিগিনকাকু বললেন, "তার একটিই কারণ, তিনি বাঙালি হলেও স্ট্যান্ডার্ড বা মান্য চলিত বাংলা জানেন না। তিনি তাঁর নিজের অঞ্চলের বাংলার, অর্থাৎ তাঁর ঘরের উপভাষা বা ডায়ালেক্টের উচ্চারণ ছাড়তে পারেননি। পুব-বাংলার কোন্ জেলার লোক তোমার মাস্টারমশাই?"

বাবা বললেন, "ঠিক জানি না। কিন্তু এ থেকে রেহাই পাব কী করে?"

হিগিনকাকু বললেন, "আরে মুশকিল, শৃণ্বন্তু, শৃণ্বন্তু। তুমি 'ওব্যাহতি' চাও তো এ ভুল থেকে?"

বাবা হেসে বললেন, "না, 'অব্যাহতি' চাই।"

হিগিনকাকু বললেন, "চমৎকার, এই তো ধরে ফেলেছে ব্যাপারটা। এবার 'অ' 'ও' হওয়ার মূল নিয়মটা বলি। এইটে এক নম্বর নিয়ম অ-এর ও হওয়ার। একটা শব্দের মধ্যে আগে যদি অ থাকে, পরে থাকে ই বা উ—তাহলে অ-টা ও হয়ে যাবে। যেমন 'নদ' ন্+অ+দ্, অত, কিন্তু নদী (নোদি) ; কিন্তু 'অত' অ+ত্+ও অতি (ওতি)। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর অনেক নিয়মের সঙ্গে এটাও আমাদের শিখিয়েছেন।

ভন্টু বলল, "বাব্বা, এখানেও রবীন্দ্রনাথ?"

স্বরধ্বনির টানাহ্যাঁচড়া

হিগিনকাকু বললেন, "এখানেও রবীন্দ্রনাথ মানে কী? তুই কি জানিস রবীন্দ্রনাথই প্রথম বাংলাভাষার নানা নিয়মকানুন খুঁজে বার করেন? সত্যিকারের ভাষাবিজ্ঞানীও বাংলাদেশে রবীন্দ্রনাথই প্রথম।"

ভন্টুর বাবা বললেন, "যাকগে, তুই যে বললি, একটা শব্দের মধ্যে আগে যদি 'অ' থাকে, পরে থাকে 'ই' বা 'উ'—তাহলে 'অ'টা 'ও' হয়ে যাবে—এর মানে কী?"

"এর মানে হল—" বলে হিগিনকাকু একটু থামলেন। থেমে বললেন, "সিলেব্‌লের ব্যাপারটাই তো তোমাদের বলা হয়নি। সিলেব্‌ল কী জানো?"

বাবা বললেন, "ছেলেবেলার ব্যাকরণ আমি সব ভুলে গেছি, এখন তুই মাস্টারি করতে এলি!"

ভন্টু বলল, "কাকু, তুমি বলো-না, সিলেব্‌ল কী?"

হিগিনকাকু বললেন, "সোজা সরল কথায়, উচ্চারণের একটিমাত্র চেষ্টায় কথার যে-টুকরো আমরা এক-একবার উচ্চারণ করতে পারি—তাই হল সিলেব্‌ল। বাংলায় বলি 'দল' বা 'ধ্বনিদল'। যেমন 'উচ্চারণ' কথাটায় আছে তিনটে

দল—উচ্-চা-রোন্। 'ভাষাবিজ্ঞান' কথাটার মধ্যে চারটে—ভা-ষা-বিগ্-গাঁন। বুঝেছ?"

ওরা দুজনেই মাথা নাড়ল।

হিগিন বলতে লাগলেন, "এখন একটা শব্দে প্রথম সিলেব্‌লে যদি 'অ' ধ্বনিটা থাকে, আর তার ঠিক পরের সিলেব্‌লে যদি ই বা উ, অর্থাৎ [+উর্ধ্ব] স্বরধ্বনি থাকে, তাহলে 'অ'-টা 'ও' হয়ে যাবে। এই দৃষ্টান্তগুলো লক্ষ করো।

ঘট	ঘটি (ঘোটি) 'ঘটি'-তে দুটো দল
চট	চটি (চোটি) 'চটি'-তেও দুটো দল
নট	নটী (নোটি) দুটো দল
বল্	বলুন (বোলুন) দুটো দল
শহর	শহুরে (শোহুরে) তিনটে দল শ-হু-রে
রঞ্জন	রঞ্জু (রোঞ্জু) দুটো দল
ঝগড়া	ঝগড়ুটে (ঝোগ্‌ড়ুটে) তিনটে দল
জঙ্গাল	জঙ্গুলে (জোঙ্গুলে) তিনটে দল
বল	বলীয়ান (বোলিয়ান) তিনটে দল
বকা	বকুনি (বোকুনি) তিনটে দল

বাবা বললেন, "এ তো জানিই। মানে সব সময় খেয়াল করি না হয়তো, কিন্তু 'জোঙ্গুলে' না বলে কেউ 'জঙ্গ্-উলে' বলে নাকি?"

হিগিনকাকু বললেন, "ঠিক আছে স্মার্ট গাই! কিন্তু কেন এটা হচ্ছে আমায় বলতে পারো? 'ই-উ' পরে থাকলেই কেন 'অ' 'ও' হচ্ছে?"

বাবা বললেন, "কেন?"

হিগিনকাকু গম্ভীরভাবে উত্তর দিলেন, "স্বরধ্বনিগুলোর দড়ি-টানাটানির, অর্থাৎ টাগ-অব-ওয়ারের জন্যে।"

জিভের কুঁড়েমি

"স্বরধ্বনির টাগ-অব-ওয়ার মানে—?" বাবা খুব অবাক।

হিগিনকাকু বিজ্ঞের ভঙ্গিতে বললেন, "ওই যে ছকটা করে দিয়েছি, লক্ষ করো

ই   উ

এ   ও

অ্যা অ

আ

এর মধ্যে দুজনের গায়ের জোর সব চাইতে বেশি। এনারা হচ্ছেন 'ই' আর 'উ'। এঁরা উঁচুতে থাকেন তো!"

ভন্টু বলল, "হ্যাঁ, তার মানে এ-দুটোই [+উর্ধ্ব] স্বরধ্বনি।"

"আঁফাঁ তেরিব্‌ল!" ফরাসিতে "বিচ্ছু ছেলে!" বলে চেঁচিয়ে উঠলেন হিগিনকাকু, "ঠিক ধরেছিস। এখন এইভাবে ভেবে দ্যাখ, যে এঁরা উঁচু লোক, মানী লোক। এঁদের আশেপাশে যে-সব স্বরধ্বনি থাকে তারা এঁদেরই কাছ ঘেঁষতে চেষ্টা করে—এঁরা কিন্তু উঁচু আসন থেকে সহজে নামেন না।"

বাবা বললেন, "সে তো তুই ভন্টুকে বোঝানোর জন্যে রূপক দিয়ে বলছিস, কিন্তু এর নিশ্চয়ই বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে একটা?"

"আরে সে একটা কাণ্ড। ওই যে জিভ—এটা খানিকটা তার দুষ্টুমি বলতে পার। সে ভাবে, 'যারা উঁচু স্বরধ্বনি, তাদের উচ্চারণ আমাকে করতেই হবে, ওপরে তো উঠতেই হবে। এখন তার আগেই যদি এমন স্বরধ্বনি থাকে যা উঁচু [+উর্ধ্ব] নয়, অর্থাৎ যার মধ্যে পড়ছে 'এ, ও, অ্যা, আ, অ'—বাকি সবগুলোই—তাদের উচ্চারণ করতে হয় একটু নীচুতে থেকে। এগুলো সব [–উর্ধ্ব] বা মাইনাস উর্ধ্ব। তাই তো?"

ভন্টু বলল, "হ্যাঁ, 'এ-ও'র বেলায় ওপরের দিকে মাঝামাঝি, আর 'অ্যা-অ'র বেলায় নীচের দিকে মাঝামাঝি আর আ-র বেলায় নীচুতে থাকে জিভ।"

"এবার বোঝো, পরে ই-উ থাকলে জিভকে খানিকটা নীচু থেকে ওপরে উঠতে হয় লাফ দিয়ে। ধরো 'ঘট' কথাটা। এটা হল ঘ্+অ+ট্। এখন তার সঙ্গে 'ই' লাগালে 'ঘটি' হবে। তখন ঘ্+অ+ট্+ই। এতে জিভকে নীচুর দিকে 'অ' বলে পরে উঁচুতে 'ই' বলতে যেতে হবে—বুয়েচ তো? এখন জিভ ভাবে, 'মহা মুশকিল, অত পরিশ্রম করব কেন? তার চেয়ে আগেই একটু উঠে থাকি না! ফলে সে 'ও'-র জায়গায় উঠে গিয়ে পরে 'ই' বলবার জন্যে তৈরি হয়। তাই যা হওয়া উচিত ছিল ঘ্+অ+ট্+ই, তা হয়ে যায় ঘ্+ও+ট্+ই। অর্থাৎ 'ঘোটি'।"

বাবা বললেন, "তার মানে জিভ শর্টকাট করছে একটা, কী বলিস?"

"মহা ফাঁকিবাজ এই জিভ। আমাদের বাঙালভাষায় যাকে বলে কামচোরা!" হিগিনকাকু বললেন মাথা ঝাঁকিয়ে।
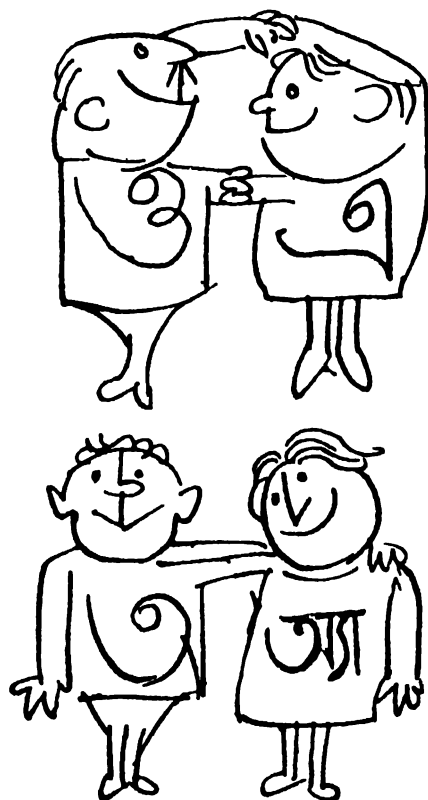
স্বরধ্বনিদের উর্ধ্বযাত্রা

“ভারি বেয়াড়া তো এই জিভটা”, ভন্টু বলে উঠল, “সবসময় খালি কাজে ফাঁকি দেবার চেষ্টা!”

হিগিনকাকু বললেন, “সে সব দেশের সব ভাষার জিভই ও-রকম একটু-আধটু চোট্টামি করে। সেইজন্যেই তো অনেক সময় ভাষা বদলে যায়। ধর জার্মান ভাষা। তাতে কোনো শব্দে প্রথমে যদি একটা [+পশ্চাৎ] স্বরধ্বনি থাকে, তার পরেই যদি থাকে একটা [+সম্মুখ] স্বরধ্বনি—জিভ আগে থেকেই সামনে এগিয়ে থাকে।

ফলে আগের স্বরধ্বনিটা একটু অদ্ভুত চেহারা পায়। ঠোঁট রয়েছে গোল, কিন্তু জিভ এগিয়ে এসছে। এর নাম 'উম্‌লাউট'। এখানে জিভ পেছন থেকে সামনে ছুটোছুটিতে একটু ফাঁকি দেবার চেষ্টা করছে। তুর্কি ভাষাতেও জিভ এইরকম করে। বাংলায় সে কমাবার চেষ্টা করছে ওপরে-নীচে ছুটোছুটি।"

"তা জার্মান জিভের ওই চালাকির নাম 'উম্‌লাউট', তো বাঙালি জিভের এই চালাকির নাম কী 'লাউট'? বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

"জার্মানে 'লাউট' মানে ধ্বনি, তা জানো তো?" হিগিনকাকু জিজ্ঞেস করলেন। "তবে বাংলায় জিভের ওই শর্টকাটের চেষ্টাকে আমরা লাউট-ফাউট বলি না। এর একটা বাংলা নাম আছে—'স্বরসংগতি'। ইংরেজিতে 'ভাওয়েল হারমনি' বলে। তবে ইদানীং একটি নতুন নাম দিয়েছে একটি মার্কিনি মেয়ে—'ভাওয়েল হাইট অ্যাসিমিলেশন' বা স্বরধ্বনির উচ্চতার সমীভবন। অর্থাৎ যেটা একটু নীচু স্বরধ্বনি সেটা তার চেয়ে উঁচু স্বরধ্বনির কাছে যাচ্ছে। ফলে

অ	হচ্ছে	ও
অ্যা	,,	এ
এ	,,	ই
ও	,,	উ

আর 'আ' কখনো 'এ', কখনো 'ও' হচ্ছে।"

বাবা খুব অবাক হয়ে বললেন, "সে কী? আমাদের স্বরধ্বনিগুলো এত-সব কাণ্ড করছে নাকি? কই, কিচ্ছু টের পাই না তো আমরা?"

"তার কারণ", বলে হিগিনকাকু আবার হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলেন "কারণ লেখাতে সবগুলো পরিবর্তন ধরা পড়ে না। এ যখন ই হয় কিংবা ও যখন উ হয় তখন লেখায় বানানে সেটা ধরা পড়ে, যেমন দেশি থেকে দিশি, খোকা থেকে খুকি। 'দে' হচ্ছে 'দি' 'খো' হচ্ছে 'খু'। আ-এর বদলে বানানে, লেখা হয় মিঠা থেকে মিঠে, কিংবা জুতা থেকে জুতো, অর্থাৎ ঠা→ঠে, তা→তো। কিন্তু অ যে ও হচ্ছে, যেমন 'ঘটি'-তে, কিংবা অ্যা যে এ হচ্ছে, যেমন দেখা [দ্যাখা] থেকে দেখুক [দেখুক] —সেটা প্রায়ই বানানে গ্রাহ্য করি না আমরা।"

ভন্টু বলল, "কিন্তু কথা হচ্ছিল অ নিয়ে। তা এত-সব আনছ কেন?"

"আরে বোকচন্দর্, পুরো প্রক্রিয়াটা তো বুঝতে হবে।" হিগিনকাকু ধমকে উঠলেন। "আসছি ফিরে অ-এর কথায়—"

অ-এর উঁচু নজর

"শব্দের মধ্যে পরে যদি 'ই' বা 'উ' থাকে তাহলে অ একটা লাফ দিয়ে এক ধাপ উঠে ও হয়ে বসছে, তা তো আগেই বলেছি।" হিগিনকাকু বলতে লাগলেন, "সেটা মোটামুটি সবাই জানি। উদাহরণ নাও-না।" বাবার দিকে আঙুল তুললেন। এমন সময় ধোঁয়া উঠতে-থাকা কালো কফি এসে পড়ায় তাঁর মুখের মাস্টারি চেহারাটা একটু কোমল হয়ে উল্লাসের চাপা আভা দেখা দিল। রাধার হাত থেকে কাপটা প্রায় কেড়ে নিয়ে সুড়ুত করে চুমুক দিয়ে চটপট চোখ বুজে ফেললেন—সেটা আরামের না গরমের জন্যে, ঠিক বোঝা গেল না। তারপর আবার শুরু করলেন, "দ্যাখো, লক্ষ করো, পশ্য, নোটিস, রেমার্কে ভূ ইত্যাদি ইত্যাদি—আমি প্রথমে এমন শব্দ বলছি যেখানে ওই 'অ' অ-ই আছে ; তার পাশে আবার এমন একটা শব্দ বলছি যেখানে 'অ' আর 'অ' নেই, 'ও' হয়ে গেছে। ক্যান্ কও তো রে বাপু—" বলে ভন্টুর দিকে আবার আঙুল উঁচিয়ে ধরলেন।

ভন্টু ভয়ে ভয়ে বলল, "এ-শব্দটায় অ-র পরে 'ই' বা 'উ' রয়েছে বলেই কি?"

"আলবাত!" বলে ভন্টুরই হাঁটু চাপড়ে দিলেন হিগিনকাকু। "এখন শব্দগুলো দ্যাখো

ঘট ঘটি (ঘোটি=ঘ্+ও+ট্+ই)

নদ	নদী	(নোদি=ন্+ও+দ্+ই)
কটা	কটু	(কোটু)
বন্ধ	বন্ধু	(বোন্ধু)
সৎ	সতিন	(শোতিন)
বর	বরুণ	(বোরুণ)
চখা	চখি	(চোখি)
সঙ্গা	সঙ্গী	(শোঙ্গি)
কর্তা	কর্তৃক	(কোর্ত্রিক্)

প্রথম যে-শব্দগুলো বলছি, লক্ষ করো, তাতে অ-এর পরে কোথাও স্বরধ্বনিই বেপাত্তা—যেমন ঘট, নদ; আবার যেখানে স্বরধ্বনি পাচ্ছি সেটা আর যাই হোক ই-উ অর্থাৎ [+উর্ধ্ব] নয়। ধরো এই 'ভন্টু' নামটায়। এটা যদি 'ভন্টা' হত, তাহলে অ-ই থাকত ভ-এর পরে। কিন্তু যে-ই আদর করে উ লাগালে ন্ট-এর সঙ্গে, অমনি হয়ে গেল 'ভোন্-টু'। বুঝলে তো।

পরের শব্দগুলো দ্যাখো, পরের সিলেব্‌লে 'ই' বা 'উ' থাকার ফলে 'অ'-এর কী দশা ঘটছে—সে সড়াত করে বিক্রমাদিত্যের বেতালের মতো ওপরে উঠে যাচ্ছে।"

"সে তো অনেকক্ষণ বুঝেছি", বাবা একটু অধৈর্য হয়ে বললেন, "কিন্তু এর কি কোনো ব্যতিক্রম নেই? সবক্ষেত্রে পরে [+উর্ধ্ব] স্বরধ্বনি থাকলেই আগের সিলেব্‌লের 'অ' 'ও' হবেই?

আর ওই যে 'কর্তৃক'। তাতে উর্ধ্ব স্বরধ্বনি কোথায়? ওটা তো ঋ-কার। 'ই' বা 'উ' 'নয় তো!' হিগিনকাকু বললেন, "আরে মুশকিল। ঋ-কে কী উচ্চারণ কর তোমরা। 'রি' তো। তাতেই তো 'ই' বসে রয়েছে।"

ভন্টুর বাবা বললেন, "হ্যাঁ, 'তাও তো বটে। 'ঋ' তাহলে ই-র ঘরেই থাকছে।"

হিগিনকাকু বললেন, "অফ্ কোর্স!"

ভন্টু বলল, "আর-একটা কথা। 'অ' শুধু এই একটা জায়গাতেই ওপরে উঠে 'ও' হয়? পরে ই-উ থাকলেই? অন্য কোথাও হয় না?

"শাব্বাশ!" বলে হাততালি দিয়ে উঠলেন হিগিনকাকু। তারপর তলানিসুদ্ধ কফির কাপ মুখে উলটে দিলেন, পরে সেটি নামিয়ে বললেন, "এক নম্বর—শব্দের প্রথমে র-ফলাওয়ালা ব্যঞ্জন-এর পরে যে 'নিহিত' অ, সেটা সবসময় ও হবে। যেমন 'প্রথম' হল 'প্রোথম', 'শ্রম' হল 'শ্রোম', 'ব্রত' হল 'ব্রোতো', ত্রস্ত হল 'ত্রোস্তো'—আঃ, এবার তোমরা বলো।" বলে অস্থির তুড়ি দিতে লাগলেন হিগিনকাকু।

বাবা বলতে লাগলেন, "প্রসাদ, শ্রবণ, গ্রহণ, দ্রবণ, ভ্রমণ..."

র-ফলার খেয়াল

"তার মানে শব্দের গোড়ায় র-ফলার সঙ্গে যদি 'অ' থাকে সেটা 'ও' হয়ে যাবে?" ভন্টু জিজ্ঞেস করল।

"হ্যাঁ, আমাদের স্ট্যান্ডার্ড ভাষায় এটা হল আর একটা জায়গা যেখানে 'অ' 'ও' হচ্ছে।" বলে ভন্টুকে বললেন, "আমার থলেতে একটা বাংলা ডিকশনারি নিয়ে এসেছি, বার করো।"

ভন্টু হিগিনের ব্যাগ থেকে একটা বাংলা অভিধান বার করল। তখন হিগিনকাকু জিজ্ঞেস করলেন, "বাংলা ডিকশনারি থেকে শব্দ খুঁজে বার করতে পারিস?"

ভন্টু 'হ্যাঁ' জানানোতে হুকুম দিলেন, অ-ওয়ালা যে-সব র-ফলাযুক্ত ব্যঞ্জন নিয়ে আছে শব্দের গোড়ায়, সেগুলো পড়ে যাবার জন্যে। ভন্টু পাতা উলটে প্রথমেই বলল 'ক্রকচ'!

"কাট! কাট!" হিগিনকাকু ফিল্‌মের ডিরেক্টর যেন, বললেন, "ও-সব ক্রকচ-ফকচ চলবে না! হটাও হটাও! আমরা মুখের কথায় যে-সব শব্দ ব্যবহার করি সেগুলো পড়ো!"

ভন্টু এবার 'ক্রতু' পড়তেই হিগিনকাকু প্রায় খেপে উঠলেন, বললেন, "আরে এখানে পরে তো 'উ' রয়েছে, ওখানে তো এমনিতেই 'অ' 'ও' হবে। তুই বাবা একটু দয়া কর আমার ওপর। এমন শব্দ পড়তে থাক যেগুলো আমরা হরহামেশা ব্যবহার করি, আর যেগুলোতে ওই অ-এর পরে 'ই' বা 'উ' অর্থাৎ [+উর্ধ্ব] স্বরধ্বনি নেই। বুঝেছিস?"

ভন্টু এবার ঠিক-ঠিক পড়তে লাগল, 'ক্রন্দন, ক্রয়,...এইভাবে। কিন্তু তাতেই এসে থমকে গেল। জিজ্ঞেস করল, "কাকু, এ কী হল?"

হিগিন দুষ্টুমিভরা চোখে বললেন, "কী সমস্যা?"

ভন্টু বলল, "তোমার নিয়মে 'ক্র' 'ক্রো' হবে, কিন্তু 'ক্রন্দন' বলছি, ক্রোন্দন বলছি না তো! আবার বলছি 'ক্রয়'। 'ক্রোয়' বলছি না তো আমরা!"

হিগিনকাকু লাফিয়ে উঠে বললেন, "শাবা—শ ছেলে! ঠিক ক্যাচ করেছিস বাবা! শোন্, 'ক্রন্দন'টা চালু কথা নয় ; পণ্ডিতের বা আধা-পণ্ডিতের কথা, তাই অ-ওয়ালা ক্রন্দনই আছে। আর 'ক্রয়'?—এটা আবার 'অয়্'-এর কারসাজি। 'অয়'-এর 'অ' কক্ষনো 'ও' হয় না। ফলে 'ক্রয়' ক্রয়ই থাকবে, 'শ্রয়' (আশ্রয়)-ও 'শ্রোয়' হবে না।" বাবা বললেন "আর-একটা শব্দ বোধ হয় আছে, যেখানে শব্দের গোড়ায় ওই 'ব্যঞ্জন+র-ফলা+অ'-এর 'অ'-টা 'ও' হচ্ছে না। তা হল 'হ্রদ'। 'হ্রোদ' বললে সব্বাই হাসবে।"

"আচ্ছা মেজদা, তোমরা বাপে-ছেলেতে আজ কী খেল্ দেখাচ্ছ বলো তো! এ-সব দারুণ-দারুণ ঠিক কথা বলে আমাকে ঘাবড়ে দিচ্ছ কেন?" হিগিনকাকু মিথ্যেমিথ্যি রাগের স্বরে বললেন কথাটা।

বাবা হাসলেন। তারপর বললেন, "কিন্তু বাকি সব গোড়াকার ক্র-, গ্র-, দ্র-, প্র-, ব্র-, ভ্র-, শ্র-, স্র-, সব 'ও' দিয়ে উচ্চারিত হবে তো?"

ভন্টু বলল, "সে তো বটেই। এগুলো তো আমরা 'ও' দিয়েই বলি, তাই না? যেমন ধরো, ক্রোম, গ্রোন্থ, গ্রোহ, ত্রোস্ত, দ্রোষ্টা, প্রোণাম, ব্রোজো, ভ্রোম..."

হিগিনকাকু শ্লেষ করে বললেন, "হ্যাঁ, 'ভ্রম' বললে ভ্রম হবে, তোমাকে 'ভ্রোম' বলতে হবে।"

ভন্টু আবার বলতে লাগল—"শ্রোদ্ধা, শ্রোবণ..."

হিগিনকাকু লাফিয়ে উঠে বললেন, "ব্যস ব্যস—এ তো রাজধানী এক্সপ্রেস ছুটিয়েছিস বাবা, আর শেষ হতেই চায় না। মোদ্দা কথাটা হল এই যে, ওই 'ক্রন্দন' 'ক্রয়', 'শ্রয়' আর 'হ্রদ' বাদ দিয়ে আর সব জায়গায় আমরা 'ও' পাচ্ছি।"

বাবা বললেন "ভাষাবিজ্ঞানী, আরও তো 'ও' পাচ্ছি, যেখানে 'অ' থাকার কথা।"

হিগিনকাকু চোখ টিপে কলকাত্তাই ভাষায় বললেন, "কোতায় পাচ্চ সে 'ও'-টিকে?"

বাবা বললেন, "কেন? আমরা বলছি গ্রোহো, গ্রোস্তো। শেষকালে হ-এ, স্ত-এ একটা ও। উচ্চারণে তাই হচ্ছে। বানানে নেই। ও-সব 'ও' আসছে কোত্থেকে?"

হিগিনকাকু বললেন, "চাইনিজ খাবার মুখে না দিয়ে আমি আর একটা কথাও বলব না!"

মাঝখানে দম ফুরিয়ে

চাইনিজ খাওয়া সেদিন ভালোই হয়েছিল, অন্তত হিগিনকাকুর পক্ষে। তিনি হাপুস-হুপুস করে, মুখচোখের মুগ্ধ ভঙ্গি করে, সে খাবার নিজেই চারভাগের তিনভাগ খেয়ে নিলেন প্রায়। তারপর ওই মুগ্ধ ভাবটা যখন চোখের পাতায় ঘুমের চেহারা নিয়ে ভারী হয়ে এল তখন 'রাধা' বলে একটা হুংকার দিয়ে পরপর দু-কাপ কালো কফি খেলেন। তারপর ভন্টু আর তার বাবার সঙ্গে আবার বসবার ঘরে চলে এলেন। বারবার বলতে লাগলেন, "বউদি, চাইনিজ রান্নার এই হাত, এটা তোমার ঈশ্বরের দান। আজেবাজে ডালভাত রেঁধে ও হাতের অপমান কোরো না!"

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "এবার বলো, গ্রন্থ, ত্রস্ত, গ্রহ, —এই যে শব্দগুলো, এগুলোতে প্রথমে তো 'ও' পাচ্ছি উচ্চারণে, গ্রো, ত্রো। কিন্তু তার পরের ও-টা—অর্থাৎ ওই- ন্থো, -স্তো, -হো, —সেটা কোত্থেকে আসছে? বানানে তো ও-কার নেই।"

হিগিনকাকু বললেন, "শুধু এগুলো কেন, এই আমি একটা লিস্টি দিচ্ছি। প্রত্যেকটা শব্দের দ্বিতীয় সিলেব্‌লটা লক্ষ করো। সেখানেও বানানে ও-কার নেই, বলতে পারি অ-কার আছে, কিন্তু অ-কারের তো কোনো চিহ্ন নেই—তবু

'ও'-ধরনের উচ্চারণ আসছে। দ্যাখো, এই শব্দগুলো।

"কলম (কলোম্), সরল (সরোল্), কাতর (কাতোর্), সকল (সকোল্), আঁচল (আঁচোল্), পিছল/পেছল (পি/পে-ছোল্), এখন (অ্যাখোন্), আপন (আপোন্), অপমান (অপোমান্), অবসান (অবোশান্)।

"আবার দ্যাখো, তৃতীয় সিলেব্‌লেও 'ও' হচ্ছে উচ্চারণে। যেমন আনন্দ (আ-নোন্-দো), বিচিত্র (বি-চিৎ-ত্রো), অন্তত (অন্-তো-তো), আশ্চর্য (আশ্-চোর্-জো), আকৃষ্ট (আ-কৃশ্-টো)। বা চতুর্থ সিলেব্‌লে—অতিরিক্ত (ও-তি-রিক্-তো),—অর্থাৎ শব্দের গোড়ায় না থেকে 'অ' ধ্বনি যদি অন্য যে-কোনো জায়গায় থাকে তাহলে সেটা সাধারণভাবে 'ও' হয়ে যায়।"

ভন্টু জিজ্ঞেস করল, "এটা তাহলে অ-এর ও হওয়ার তিন নম্বর নিয়ম?"

বাবা বললেন, "কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে কেন? আমাদের 'অ'-টার দেখি কোনো ব্যক্তিত্ব নেই, যেখানে পাচ্ছে সেখানেই বদ্‌লে গিয়ে ঝপাঝপ্ 'ও' হয়ে যাচ্ছে।"

"হ্যাঁ", হিগিনকাকু মুখটা করুণ করে মাথা নাড়লেন, যেন 'অ'-এর দুর্দশায় তাঁর চোখে জল আসছে প্রায়—"বেচারা 'অ'। এর হেনস্তাই সবচেয়ে বেশি।"

ভন্টু বলল, "কিন্তু এই যে শব্দের গোড়ায় রইল না, পরে ই-উ-ও নেই, তবু যে কিছু 'অ' 'ও' হয়ে যাবে, এ কী-রকম কথা!"

হিগিনকাকু বললেন, "তবে শোনো। আমরা যখন শব্দ উচ্চারণ করি, তখন একটা জিনিস ঘটে। তাকে বলে স্ট্রেস, ঝোঁক, বল বা শ্বাসাঘাত। ইংরেজিতে শব্দের কোন্ সিলেব্‌লের ওপর এই ঝোঁক পড়বে তার বাঁধা নিয়ম আছে, যেমন টে্ব্‌ল, কিন্তু ট্যাবিউলার। প্রথমটায় টে-তে, পরেরটায় বি-তে ঝোঁক পড়ছে। কিন্তু বাংলায় সাধারণভাবে আমরা শব্দের গোড়াকার সিলেবলে ঝোঁক দিই। এখন গোড়ায় খানিকটা জোর দিয়ে ফেলার ফলে তারপর ঝোঁকের মাঝপথে দম ফুরিয়ে যায়, তখন ঠোঁট বলে, "আমি বাপু ক্লান্ত, আবার একটা 'অ' বলতে হলে যতটা খুলতে হবে আমি অতখানি খুলতে পারব না।" তখন ঠোঁট কষ্টেসৃষ্টে 'ও' পর্যন্ত খোলে। এখানে 'অ'-এর 'ও' হওয়া ওই দম ফুরোনোর জন্যে।"

ভন্টু বলল, "কী কাণ্ড, এ তো শুধু ঠোঁটের আলসেমির জন্যে।"

হিগিনকাকু বললেন, "নিশ্চয়ই। তাতে আরও একটা কেলোর কীর্তি ঘটেছে।"

আরও কেলেঙ্কারি

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "কেলোর কীর্তি? সেটা আবার কোথায় হচ্ছে?"

হিগিনকাকু বলতে লাগলেন, "কথা কী হচ্ছিল? হচ্ছে আমাদের শিষ্ট চলিত বাংলায়।" বলেই বিরক্তি-সূচক 'আহ্' করে উঠলেন, বাঁ হাতের চেটোয় ডান হাত দিয়ে অধৈর্য হয়ে ঘুষি মারলেন একটা। বললেন, "এই 'শিষ্ট' কথাটা এখানে আমার একদম ভাল লাগে না। আসলে যখন পণ্ডিতরা কথাটা বানিয়েছেন তখন তাঁরা বিশ্বাস করতেন, একটা 'ভালো' ভাষা আছে, শিক্ষিত 'ভদ্রলোকের' ভাষা। বাকি ভাষাগুলো, অর্থাৎ বাকি উপভাষাগুলো সে-অর্থে ভালো নয়। সেগুলো 'অ-শিষ্ট' ভাষা। ক্যান্ রে দাদা, সে উপভাষাগুলো কি বানের জলে ভেসে এসেছে?"

ভন্টু বলল, "হ্যাঁ, তুমি তো সেদিন বলছিলে, কোনো ভাষাই অন্য কোনো ভাষার চেয়ে ছোটো বা বড়ো নয়। সব ভাষাই নিজের নিজের এলাকায় মূল্যবান—"

"এটা কি আমাদের দেশ বলেই ভাষায় ভাষায় এ-রকম একটা জাতিভেদপ্রথা

তৈরি হয়েছিল নাকি রে? একটা ভাষা ব্রাহ্মণ, আর বাকি সব ভাষা শূদ্র?" ভন্টুর বাবা একটু হেসে জিজ্ঞেস করলেন।

"না, বিদেশেও একসময় ভাষার জাতিভেদ মেনেছে লোকে। রাজধানীর ভাষা, পুরোত-পণ্ডিতদের ভাষা—সব কুলীন বলে গণ্য হয়েছে। কিন্তু এখন তো ওসব মান্নি না আমরা। ওই 'শিষ্ট-ফিষ্ট' থাক, আমি স্ট্যান্ডার্ড ভাষাই বলব।" কিংবা 'মান্য চলিত বাংলা'। সংক্ষেপে মা-চ-বা, কেমন?" হিগিনকাকু জেদ ধরলেন যেন।

ভন্টু বলল, "ঠিক আছে কাকু, এখন এই মা-চ-বাতে কী কেলেঙ্কারি হচ্ছে?"

হিগিনকাকু ভন্টুর হাত টেনে নিয়ে 'হ্যান্ডশেক' করলেন, বললেন, "ঠিক সুতোটা ধরিয়ে দিয়েছিস তো? আরেকটু হলেই খেই হারিয়ে ফেলতুম। শব্দের ওই গোড়ার—" বলে একটু কেশে নিয়ে বলতে লাগলেন, "শব্দের ওই গোড়ার সিলেব্‌লে ঝোঁক পড়ার ফলে উচ্চারণের জোর পরের দিকে কমে যাচ্ছে, তাই তো? তার ফলে আমরা দেখলুম যে, শব্দের গোড়ায় না থেকে 'অ' যদি আর কোথাও থাকে তাহলে সেটা 'ও' হচ্ছে। আগে তার উদাহরণ দিয়েছি। যেমন 'হরণ'-এ রোন্—হরোন্। তেমনি কম্বল (কম্‌বোল), কলম (কলোম), তরল (তরোল), অশান্ত (অশান্তো) ইত্যাদি। এতে ঠোঁটের কুঁড়েমিতে 'অ'টা 'ও' হচ্ছে। কিন্তু এই কুঁড়েমি এমনই দাঁড়াচ্ছে যে, কোথাও কোথাও 'অ' বা অন্য স্বরধ্বনি থাকলে মুখ তাকে উচ্চারণই করছে না। বলছে, 'অদ্দূর টানতে পারব না দাদা, যদি কিছু মনে না কর, শব্দটাকে একটু ছেঁটে দিই!' তখন সংস্কৃতে যা ছিল 'ফল' (ফ্+অ+ল্+অ), সেটা বাংলায় হয়ে গেল (ফ্+অ+ল্)। অর্থাৎ শেষের 'অ'-টাকে উৎখাত করে দেওয়া হল। (জ্+অ+ল্+অ) হল (জ্+অ+ল্), (আ+ক্+আ+শ্+অ) হল আকাশ্। এটা ওড়িয়া ভাষার সঙ্গে তুলনা করলেই বুঝতে পারবে। সেখানে শব্দের শেষে অ-ধ্বনি প্রায় সর্বত্র আছে। শুধু তাই নয়, বাংলায় 'গামোছা' শব্দটা যে 'গাম্‌ছা' হচ্ছে, জানালা হচ্ছে 'জান্‌লা'—তার মূলেও ওই গোড়াকার ঝোঁক। এরই ফলে কলকাতার পুরোনো কিছু বাঙালির মুখে 'বলেছি' হয় 'বলিচি', 'শুনেছি' হয় 'শুনিচি'। শুধু তাই নয়, 'খ' হয়ে যায় 'ক' অনেক শব্দে—যেমন একন্, ওকানে, তকন। ঝোঁক পড়ছে গোড়ায়, মুখ দম ফুরিয়ে ধ্বনি বদলে দিচ্ছে, ধ্বনি ছেঁটে ফেলছে। দ্যাকো দিকিনি কাণ্ড!"

বাবা বললেন, "কেলোর কীর্তিই বটে।"

নাকের নষ্টামি

ভন্টু জিজ্ঞেস করল এবার, "আচ্ছা কাকু, এই যে 'অ' 'ও' হয়ে যাচ্ছে—তার এতরকম রাস্তা আছে নাকি আমাদের বাংলাভাষায়?"

"কত রকম রাস্তা?"

"কেন? এই যে, পরে 'ই', 'উ' থাকলে গোড়ার সিলেব্‌লের 'অ' 'ও' হচ্ছে—"

হিগিনকাকু 'গুপী গায়েন বাঘা বায়েন'-এর সেই গানে বাঘার মতো বলে উঠলেন, "এক নম্বর—"

ভন্টু সামান্য একটু থমকে বুঝে নিল ব্যাপারটা। তারপর হেসে বলল, "দু'নম্বর হল—ওই যে, শব্দের গোড়ায় র-ফলাওয়ালা অক্ষর থাকলে তার সঙ্গেকার 'অ' 'ও' হচ্ছে—"

হিগিনকাকু ভন্টুকে থামিয়ে বাবার দিকে মাস্টারমশাইয়ের মতো আঙুল বেঁকিয়ে কাছে ডাকার মতো ভঙ্গি করে বললেন, "ইয়ু, ইয়ু নেক্‌স্‌ট! মেজদা, তুমি বলো তিন নম্বর কী হবে!"

ভন্টুর বাবা হেসে উঠে বললেন, "কেন, তিন নম্বর হল ওই দম ফুরিয়ে 'ও'। শব্দের গোড়ায় ঝোঁক পড়ার ফলে পরের 'অ'-টা 'ও' হয়ে যাচ্ছে! ঠিক বলেছি তো গুরুমশাই?

হিগিনকাকু হাত তুলে বরাভয় দিলেন, বললেন, "দিব্য হয়েছে। এখন ভন্টু, তুমি বলো, এক নম্বর নিয়মে কী দাঁড়াচ্ছে। উদাহরণ দাও, উদাহরণ!"

ভন্টু বলল, "এক নম্বর নিয়মে অত-র 'অ' 'অতি'-তে 'ও' হচ্ছে, সৎ-এর (স্+অ+ত্) 'অ' সতী-তে (স্+ও+ত্+ই) 'ও' হচ্ছে।"

হিগিনকাকু বললেন, "আবসোল্‌তো বোন্"—পোর্তুগিজ ভাষায়। অর্থাৎ—দারুণ ভালো। "আর দু'নম্বর নিয়মে কী দাঁড়াচ্ছে?"

"দু'নম্বর নিয়মে যার উচ্চারণ হওয়া উচিত ছিল প্রথম (প্+র্+অ+থ্+অ+ম্) তা হয়ে যাচ্ছে, 'প্রোথম', 'ব্রত' হচ্ছে 'ব্রোত', 'শ্রবণ' হচ্ছে 'শ্রোবণ।"

"ভন্টুবাবা কী জয়!" চেঁচিয়ে উঠলেন হিগিনকাকু। "এবার তিন নম্বরে?"

বাবা আগেভাগে বলে উঠলেন, "তিন নম্বর নিয়মে ওই 'প্রোথম' আবার হচ্ছে 'প্রোথোম্', 'ব্রত' হচ্ছে 'ব্রোতো', শ্রোবণ হচ্ছে স্রোবোন্, পাগল হচ্ছে পাগোল্, কলম হচ্ছে কলোম্।"

হিগিনকাকু এবার রাশিয়ানে বলে উঠলেন, "ওম্‌লিচ্‌নো!" অর্থাৎ চমৎকার!—"তবে গল্প এখানেই কিন্তু শেষ হচ্ছে না!"

বাবা বললেন, "সে কী রে? আরও নিয়ম আছে নাকি? অন্য কোথাও 'অ' 'ও' হচ্ছে আরও? এ কী সর্বনেশে কথা!

"হ্যাঁ হচ্ছে। সে নিয়মটার নাম দিতে পারো নাকের নষ্টামি! এই ধরো 'ধন', 'মন', 'জন', এইসব কথা। কীভাবে বলি আমরা? বলি 'ধোন্', 'মোন্', 'জোন্', —এই তো? এখানে কী দেখছি? শব্দগুলো যে-রকম সিলেব্‌লে তৈরি, তা রুদ্ধ, মানে ব্যঞ্জনে শেষ হচ্ছে তা। আর ওই ব্যঞ্জনটা একটা নাসিক্য ধ্বনি—যার আওয়াজ নাক দিয়ে বেরোয়। 'ঙ্' 'ন্' 'ম্' হল মান্য চলিত বাংলার তিনটে নাসিক্য ব্যঞ্জন। অর্থাৎ এগুলো আমাদের কথায় উচ্চারিত হয়। 'ঞ' আর 'ণ'-র আলাদা কোনো উচ্চারণ নেই আমাদের বাংলায়। আমরা দেখছি যে, সিলেব্‌লের শেষে যদি ওই নাসিক্য ব্যঞ্জন থাকে, তাহলে তার আগেকার 'অ' সাধারণত 'ও' হয়ে যায়—যেমন আরও উদাহরণ, সংসার [কারও-কারও উচ্চারণে—সোংসার] মণ্ডল [মোণ্ডোল], সম্ভব [কারও-কারও ক্ষেত্রে 'সোম্ভোব']। এ-নিয়মের প্রচুর ব্যতিক্রম আছে—সে পরে আসছে, কিন্তু কাণ্ডটা বুঝতে পারছ তো?"

ভন্টুর বাবা বললেন, "কাণ্ড দেখে আক্কেল গুড়ুম। নাকের এমন নষ্টামি?"

য-ফলার হুজ্জোতি

"নাকের নষ্টামির এখনই কী দেখলে।" হিগিনকাকু বললেন, "যত শুনবে ততই রোমাঞ্চিত হবে। বিশ্বাস হচ্ছে না? এই দ্যাখো-না—মন (ম্+অ+ন্)-এ 'ম' হচ্ছে 'মো'। তা থেকে আবার শব্দের গোড়ায় 'ম' থাকলে 'মো' বলার একটা ঝোঁক এসে যাচ্ছে সকলের। ফলে আমরা কেউ কেউ 'মহা'-কে বলছি 'মোহা'-, যেমন 'মোহারাজ', 'মোহাশয়', 'মোহাকাল'। 'মতো'-কে বলছি 'মোতো'। তবে এটা স্টান্ডার্ড নয়।

ভন্টু হাততালি দিয়ে বলল, "খুব মজা তো! আমাদের রাধাপিসি আবার ঠিক উলটো বলে। সে আবার ওকারকে 'অ' করে দেয়। বলে, 'বুইলি (বুঝলি) 'খকা', 'লক'টা যেমনি 'মটা' তেমনি 'বকা'।"

"হ্যাঁ, দোখনো বাংলায় ওরকম হয় কখনও কখনও। কিন্তু খবরদার, মা-চ-বাতে 'খোকা' 'লোক' 'মোটাই' বলবে, বুঝেছ?" ধমকে উঠলেন হিগিনকাকু।

"কিন্তু, তাহলে সব মিলিয়ে কটা নিয়ম হল—'অ' 'ও' হওয়ার? চারটে?

পাঁচটা?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

"তা ধরো পাঁচটাই। ভন্টু, এবার নিয়মের লিস্টিটা যা দাঁড়াল একবার আমাদের শুনিয়ে দেবে নাকি?"

ভন্টু বলল, "এক নম্বর : পরে ই-উ অর্থাৎ [+উর্ধ্ব] স্বরধ্বনি থাকলে 'অ' 'ও' হয়। দু নম্বর হল : শব্দের গোড়ায় র-ফলাওয়ালা ব্যঞ্জনের 'অ' 'ও' হয়; তিন নম্বর : 'অ' যদি শব্দের মধ্যে বা শেষে থাকে তাহলে গোড়ায় ঝোঁক পড়ায় সে দুর্বল হয়ে 'ও' হয় ; চার নম্বর : ব্যঞ্জনের পরে অ, তারপরে যদি নাসিক্য ব্যঞ্জন থাকে, তাহলে ওই 'অ' 'ও' হয় (এটা ছোট্ট নিয়ম) ; পাঁচ নম্বর : 'ম' [ম্+অ] শব্দের গোড়ায় কখনো 'মো' [ম্+ও] হয়ে যায়।"

হিগিনকাকু হঠাৎ সোজা হয়ে বসে নিজের মাথায় যে-কটা চুল আছে তা মুঠো করে ধরে টানতে লাগলেন, নিজের হাতেই চিমটি কাটলেন, নাক-কান টানলেন একটু, তারপর মাথাটা কয়েকবার ঝাঁকিয়ে ভন্টুদের জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, আমি কি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম?"

"কেন? কই, টের পাইনি তো!" ভন্টুর বাবার গলায় কৌতুক।

"নিশ্চয়ই পড়েছিলাম। নইলে য-ফলার হুজ্জোতির কথা ভুলে যাব কেন? শিগগির আর-এক কাপ কালো কফি!"

"য-ফলার হুজ্জোতি!" ভন্টু আর তার বাবা দুজনেই অবাক কণ্ঠে বলে উঠল।

"তা নয় তো কী! এই দ্যাখো-না, শব্দের গোড়ার সিলেব্‌লে যদি 'অ' থাকে, আর তারপরের ব্যঞ্জনে যদি লেখায় য-ফলা থাকে, তাহলেও এই 'অ' 'ও' হয়ে যায়। যেমন ধরো (বানান করে বললেন) অদ্য, পদ্য, সভ্য, নব্য, সত্য, হত্যা, সন্ধ্যা, যদ্যপি, পর্যন্ত, সহ্য। এগুলোর উচ্চারণ কী?"

বাবা বললেন, "ঠিক বলেছিস হিগিন, আমরা তো বলি ওদ্দো, পোদ্দো, শোব্‌ভো, নোব্বো, শোত্তো, হোত্তা, শোন্ধা, জোদ্দোপি, পোর্জোন্তো, শোজ্‌ঝো। অবাক কাণ্ড!"

"শুধু য-এর হুজ্জোতি! অ-এর পরে যদি 'ক্ষ' আর 'জ্ঞ' থাকে— যেমন (আবার বানান করলেন) রক্ষা, বক্ষ, পক্ষ, যজ্ঞ? সেগুলো কী উচ্চারণ করি?"

ভন্টু ধীরে ধীরে বলতে লাগল, "রোক্‌খা, বোক্‌খো, পোক্‌খো, জোগ্‌গোঁ।"

ভন্টুর বাবা চোখ বুজে ফেললেন। বললেন, "দোহাই হিগিন, আর বলিস না। আমার মাথা তাজ্‌ঝিম-মাজ্‌ঝিম করছে। কালো কফি আমার বিশ্রী লাগে, কিন্তু আমিও এখন এক কাপ কালো কফি খাব।"

ভন্টু বলল, "আমিও খাব বাবা!"

বাবা বললেন, "ঠিক আছে। রাধা, এ-ঘরে এক গামলা কালো কফি নিয়ে এসো!"

পুরোনো পড়া

কালো কফির কাপে চুমুক দিতে দিতে হিগিনকাকু বললেন, "ভন্টুসাহেব, আরেকবার লিস্টিটা আউড়ে— কতভাবে 'অ' 'ও' হচ্ছে—বলে দাও তো বাবা আত্মারাম—"

ভন্টুর 'আত্মারাম' কথাটা খুব ভালো লাগল না বলে একটু চোখমুখ কুঁচকে বিরক্তির ভঙ্গি করল। তারপর অবশ্য সুবোধ ছেলের মতো গড়গড় করে বলে গেল—

"এক নম্বর : শব্দের গোড়ার সিলেব্‌লে 'অ' আর তার পরে যদি [+ঊর্ধ্ব] স্বরধ্বনি, অর্থাৎ 'ই' বা 'উ' থাকে; কারণ, ঊর্ধ্বস্বরের টানাহ্যাঁচড়া।

দু নম্বরে আছে গিয়ে—শব্দের গোড়ায় র-ফলা-ওয়ালা ব্যঞ্জনের সঙ্গে যে 'অ' থাকে, তা-ও 'ও' হয় ; কারণ, ঠোঁটের আলস্য।

তিন নম্বর : শব্দের মাঝখানকার আর শেষের নিহিত 'অ', পাগল, কাগজ, সরল ইত্যাদি শব্দের 'গ্‌', 'গ্‌', 'র্‌'-এর সঙ্গে যে 'অ' আছে; আর 'নব' 'হত' 'অন্তত' 'নভ' ইত্যাদির শেষে যে 'অ' আছে; কারণ আগে ঝোঁক পড়েছে, তাই 'এ' 'অ'-এর ওপর ঝোঁক বা শ্বাসাঘাতের অভাব।

চার নম্বরে : মন=মোন, বন=বোন, ধন=ধোন ইত্যাদি। কিন্তু বনানী।

পাঁচ নম্বরে : মোহা, মোশা মোতো। (এ দুটোই ছুটকো নিয়ম)।

ছয় নম্বর : শব্দের গোড়ার সিলেব্‌লে 'অ', আর পরের সিলেব্‌লের বানানে যদি য-ফলা, বা ক্ষ, জ্ঞ থাকে, তাহলেও ওই আদি 'অ' 'ও' হবে! কারণ" —থমকে গেল ভন্টু।

হিগিনকাকু তার মুখ থেকে কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, "কারণটা নতুন কিছু নয়, ওই এক নম্বরেরই মতো। আমরা বাঙালরা এর কারণটা ভালোই বুঝি।" ভন্টুর বাবা 'আমরা বাঙালরা' শুনে খাড়া হয়ে বসলেন। এইখানে তাঁর একটু দুর্বলতা আছে। দেশ ভাগের পর পশ্চিমবঙ্গে এসে যখন ভর্তি হয়েছিলেন ইস্কুলের নীচু ক্লাসে, তখন ক্লাসসুদ্ধ ছেলে তাঁকে ভাষার জন্যে 'বাঙাল' 'বাঙাল' বলে খ্যাপাত। সে-সময়কার কষ্ট, অশ্রুপাত, মারপিট ইত্যাদির কথা তাঁর খুব মনে আছে। অবশ্য যাদের সঙ্গে মারপিট হয়েছিল, তাদের সকলেই পরে তাঁর প্রাণের বন্ধু হয়ে যায়। তবু 'বাঙাল' বললে এখনও তাঁর—যাকে বলে ঘাড়ের লোম খাড়া হওয়া—তাই হয়। বললেন, "তার মানে?"

হিগিনকাকু তাঁকে আশ্বাস দিলেন, "আরে রও রও বড়দা, চেইত্যা যাও ক্যান্?"

ভন্টুর বাবা হেসে ফেললেন। হিগিনকাকু বললেন, "শোনো-না, আমরা বাঙালরা ওসব কথা কীভাবে উচ্চারণ করি? যা 'পদ্য'—তাকে বলি 'পোইদ্য'; যা 'সত্য', তাকে বলি 'সোইত্য', যা 'লক্ষ', তাকে বলি 'লোইক্ষ', 'যজ্ঞ' তাকে বলি 'যোইজ্ঞ'। তাই তো?"

ভন্টু বলল, "এটা কিন্তু হিগিনকাকু ঠিক বলেছে বাবা।"

"দাঁড়া বাবা ভন্টু, এমন দৌড়োস্ না।" আমি যা বলতে চাইছি তা হল, একসময় বাঙালিদের সকলেই, এমনকি পশ্চিমবঙ্গের বাঙালিরাও এইরকম উচ্চারণ করত। এই ই-টা এসে যায় অপিনিহিতির ফলে—যা তুমি ইস্কুলের ব্যাকরণে পড়েছ। তখনই—ওই পরে 'ই' এসে গিয়েছিল বলে, তার আগের 'অ' 'ও' হয়েছিল। পরে পশ্চিমবঙ্গের উচ্চারণ থেকে 'ই'-টা খসে যায়, ফলে 'পোইদ্য' হয় 'পোদ্য' [পোদ্দো], 'বোইক্ষ' হয় 'বোক্ষ' [বোক্‌খো]। আমরা বাঙালরা ওই 'ই'-কে ত্যাগ করিনি, মায়ার বাঁধনে বেঁধে রেখে দিয়েছি। 'ই' খসে গেল এপারে, কিন্তু 'অ' যে 'ও' হয়েছিল তার টানে, সেটা থেকেই গেল। বুঝেছ?"

বাবা বললেন, "কী কাণ্ড!"

এতেই হবে।" এবার বিদ্রোহী 'অ'-দের কথা শোনো।"

"বিদ্রোহী 'অ'?"

"হ্যাঁ, যারা 'ও' হতে চায় না, সেইসব 'অ'। শোন বলছি—"

বিদ্রোহী অ-এর বাহিনী
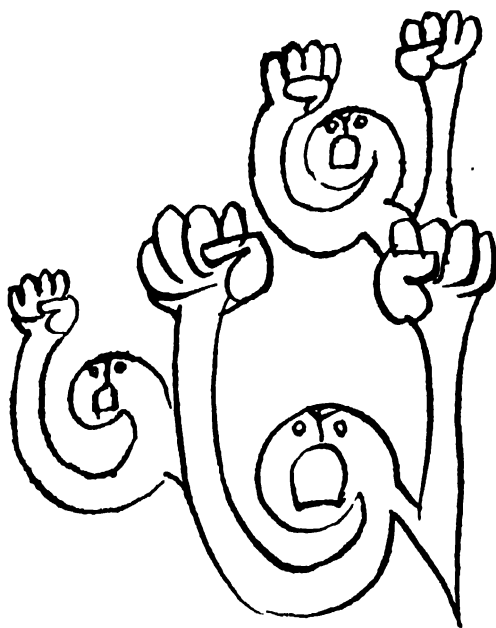
ভন্টুর বাবা বললেন, "এই বিদ্রোহী 'অ' কারা, যারা 'ও' হতে চায় না?"

হিগিনকাকু হেসে বললেন, "তুমি বোধ হয় ভেবেছিলে বাংলাভাষায় 'অ' মাত্রেই দুর্বল গোবেচারা কাপুরুষ? যে পাচ্ছে সে-ই তাকে ধরে ধরে 'ও' বানিয়ে দিচ্ছে? তা কিন্তু নয়। একদল 'অ' আছে যারা মাথা উঁচু করে চলে। বলে, "আমরা 'অ' আছি, 'অ'-ই থাকব!"

ভন্টু অধৈর্য হয়ে বলল, "আঃ কাকু, বক্তৃতা ছাড়ো। বলো না কোন্ 'অ'গুলো বদলায় না।"

"ডাঁড়া বাবা, ডাঁড়া," হিগিনকাকু তাঁর এক হাওড়ার বন্ধুর ভাষা নকল করলেন, তারপর হাত তুলে বললেন, "শোন্, এদের মধ্যে পয়লা নম্বর হল উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা 'অ'!"

"উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা 'অ' মানে?" বাবা আর ভন্টু একসঙ্গে জিজ্ঞেস করে উঠল।

"মানে হল, এরা সেইসব 'অ', যারা আসলে শব্দটার মধ্যে ছিল না, কিন্তু

উপসর্গে হোক, অন্য কোনোভাবে হোক, শব্দের আগায় এসে লট্‌কে গিয়ে নতুন শব্দ বানিয়েছে। সেই 'অ' কিন্তু সহজে বদলাবে না—পরে ই থাক, উ থাক, য-ফলা, জ্ঞ, ক্ষ যাই থাক—সে গোঁ ধরে বসে থাকবে।"

বাবা বললেন, "উদাহরণ? উদাহরণ?"

হিগিনকাকু বললেন, "এই ন্যাও তোমার উদাহরণ—

অ-পূর্ব [*ওপূর্ব] হবে না
অ-সীম [*ওসীম] ,, ,,
অ-ধীর [*ওধীর] ,, ,,
সম্পূর্ণ [*সোম্-পূর্ণ] ,, ,,
(সম্ হল স্+অ+ম্)
অ-ব্যাহত [*ওব্যাহত],, ,,
অ-ন্যায় [*ওন্যায়] ,, ,,
অ-ক্ষত [*ওক্ষোত] ,, ,,
অ-জ্ঞাত [*ওজ্ঞাত] ,, ,,

বাবা বললেন, "এতক্ষণে বুঝলাম 'ওব্যাহত' কেন ভুল। কিন্তু সবসময় এরকম হবেই? কোনো ব্যতিক্রম নেই?

হিগিনকাকু বললেন, "অত যদি ব্যতিক্রম পছন্দ তোমার, তাও দিচ্ছি দু-চারটে। ধরো 'অতুল' কথাটা। উচ্চারণ সব সময় হওয়া উচিত ছিল [অ-তুল]। কিন্তু নাম হলেই আমরা বলি [ওতুল]। অন্য জায়গায় নয়। যেমন 'ওতুল বাড়ি যাচ্ছে'। কিন্তু 'জগতে অ-তুল রত্ন নাম ইন্দ্রনীল'।"

ভন্টু বলল, "এ আবার কী কাণ্ড!"

"হুঁ হুঁ বাবা, কাণ্ড মানে কাণ্ড। আসলে 'অতুল' নামটায় যে 'অ' সেটাকে আমরা উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা মনেই করি না। তাই সেটাকে বদলে দিই। এইরকম আর-একটা নাম 'অসুর'। মা-দুর্গার শত্রুপক্ষ। এটা 'ওশুর' শুধু নাম হিসেবে। কিন্তু 'আমার গলায় সুরের বদলে অসুর বাসা বেঁধেছে।' এখানে এটা 'অ-শুর'। আবার এর উলটো ঘটনাও আছে।"

বাবা বললেন, "সে কী?"

হিগিনকাকু বললেন, "ধরো 'অণিমা' বা 'অরিন্দম'। এখানে 'অ'টা উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা নয়, কিন্তু আমরা ধরে নিই যে, সে উটকো। তাই তাকে 'অ' হিসেবে রেখে দিই, 'ও' বানাই না। বলি না 'ওণিমা' বা 'ওরিন্দম'।

এইরকম আরও নাম 'অরিন্দম', 'অতীন', 'অতীশ'। এগুলো 'অরি' 'অতি' দিয়ে। 'অরি' আছে অরিন্দমে—তা তো 'ওরি'ই বলি আমরা। অথচ এখন বলছি অ-রিন্দম। অতী+ইন্দ্র থেকে অতীন, অতি+ঈশ থেকে অতীশ। উচ্চারণ হওয়া

উচিত ছিল 'ওতিন্' 'ওতিশ্'। কিন্তু কে বোঝাবে সে কথা আমাদের। আমরা দিব্যি বলে যাই অ-তিন্, অ-তিশ্। এইভাবে 'অমিয়'-কে কেউ বলে 'ওমিয়ো' কেউ বলে 'অ-মিয়ো'।

বাবা বললেন, "কে পাগল, আমাকে বলবি? আমরা, না ওই 'অ'?"

পাঠকদের জন্য : * চিহ্নওয়ালা শব্দটি ভুল শব্দ। এখানে ভুল উচ্চারণের শব্দ।

আরও বিদ্রোহী 'অ'

ভন্টুদের বৈঠকখানায় হিগিনকাকু, বাবা এবং ভন্টুর ওই তিনজনের ছোট্ট দলে কালো কফির কদর আরও বেড়েছে। ঠাকুমা একটু গজগজ করেন, 'ওইটুকু পোলার কোপি-মোপি খাওঅন ভাল্ না।' কিন্তু কেউ তাঁর কথায় বিশেষ কান দিচ্ছে না— সকলে বিদ্রোহী 'অ'-দের নিয়ে উত্তেজিত। হিগিনকাকু উশকে দিচ্ছেন, বলছেন, "খোঁজো তোমরা, খুঁজে বার করো সেই সব বীর 'অ'-এর দলকে—যারা বদলাতে চায় না, 'ও' হতে চায় না। একা আমিই সব বলব কেন?"

বাবা বললেন, "তা তুই আমাদের একটু গাইড কর, একটা সূত্র-টুত্র ধরিয়ে দে, নইলে আমরা আনাড়িরা কী করে সেই 'অ'-দের হদিস পাব। এ-রকম গোয়েন্দাগিরি তো আগে করিনি।"

"বেশ সূত্র দিচ্ছি। প্রথমে শব্দের গোড়াকার 'অ'-গুলোকে ধরো, দ্যাখো কোন্‌গুলো বদলাচ্ছে না—"

ভন্টু বলে উঠল, "সে তো এর মধ্যে ধরেছি আমরা—ওই যে উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা 'অ'—"

হিগিনকাকু বললেন, "হ্যাঁ, ওই 'না'-মার্কা 'অ'। আচ্ছা বড়দা, না-মার্কা 'অ' ছাড়া আর-কিছু নেই?"

বাবা একটু ভেবে বললেন, "'অন্' আছে না—যেমন 'অনাদর' মানে

অন+আদর?

ভন্টু বলল, "বাবা, এটা তুমি কী উদাহরণ তুললে? 'অন'-এর 'অ' এখানে তো বদলাবে না, পরে তো 'আ' আছে এর। তাই না কাকু?"

হিগিনবথাম এবার লাফিয়ে উঠে ভন্টুকে দু'হাতে সাপটে বুকে তুলে নিয়ে হই-হই করে উঠলেন। তারপর সোফার ওপর দাঁড় করিয়ে দিলেন যেন সেটা স্পোর্ট্সের মাঠের ভিক্‌ট্রি স্ট্যান্ড! তারপর বললেন, "জিতা রহো বেটা! তোমার ভাষাবিজ্ঞানী হওয়া আটকায় কেডা!"

বাবা খুশি-খুশি মুখে বললেন, "কিন্তু যে-কোনো 'অন্'-এর 'অ'-ই কি বদলাবে?"

"না, বদলাবে না। ওই তো মজা। 'অন্'-এর 'অ'-টাও তো উড়ে-এসে-জুড়ে-বসা অ। ধরো যেমন—

অনিচ্ছা ঃ * ওনিচ্ছা নয়
অনূর্ধ্ব ঃ * ওনুর্ধো নয়
অনৃত ঃ * ওনৃতো নয়
অনুদ্বেগ ঃ * ওনুদ্‌বেগ নয়

আর শুধু অন্-এর 'অ' কেন, 'সম্'-এর [স্+অ+ম্] 'অ'-ও বদলায় না। এই দ্যাখো—

সংকীর্তন : * শোংকির্তোন নয়
সকৃতজ্ঞ : * শোক্রিতোগ্‌গোঁ নয়
সম্মুখ ঃ * শোম্‌মুখ নয়
সম্মিলন ঃ * শোম্মিলন নয়
সংহিতা ঃ * শোংহিতা নয়
সশিষ্য ঃ * শোশিশ্‌শো নয়
সপুত্র ঃ * শোপুৎত্রো নয়।
সপ্রীতি ঃ * শোপ্‌প্রিতি নয়।

তবে ব্যতিক্রমও ঘটছে। যেমন 'সম্বিৎ' [শোম্বিৎ], 'সংগীত' [শোংগিৎ], সঞ্চিত [শোঞ্চিতো]। তার মানে একে-একে এই সব 'অ'-গুলো আত্মসমর্পণ করছে, আর নিয়মকে বুঝতে পারছে না।"

ভন্টু বলল, "কেন?"

"কেন? তার কারণ বদলে-যাওয়া 'অ'-রা দলে ভারী, তাদের চাপ বাকি 'অ'-দের পক্ষে বেশিদিন ঠেকিয়ে রাখা মুশকিল। কিন্তু এখন আমার ঘুম পাচ্ছে, আমি বাড়ি চললুম।" বলে হিগিনকাকু চক্ষের নিমেষে হাওয়া হয়ে গেলেন।

বিদ্রোহী 'অ'—৩

পরের রোববার সকালে হিগিনকাকু যখন এসে হাজির হলেন তখন বাড়িতে ধুন্ধুমার কাণ্ড হচ্ছে। ঘরের ছাদ, দেয়াল আর মানুষের কানের পর্দা প্রায় চৌচির করে কাঁসরঘণ্টা বাজছে। তোমরা ভাবছ নিশ্চয়ই বাড়িতে কোনো পুজোটুজো। তা নয়। আসলে এখন ভন্টুর বোন তিন্নি কিছুতেই দুধ খেতে চায় না, বোতল মুখে দিলে নিজের হাতেই বার করে আনে। একদিন তাকে 'ওই দ্যাখো পাখি' এইসব বলে দুধ খাওয়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছিল আর সে নানাভাবে মুখ সরিয়ে নিচ্ছিল। এমন এক সময় নীচে বিষ্যুতবারের লক্ষ্মীপুজো উপলক্ষ্যে কাঁসরঘণ্টা বেজে ওঠে, আর সে চমকে গিয়ে বোতল শেষ করে দুধটুকু খেয়ে নেয়। সেই থেকে নীচের ভাড়াটেদের কাঁসরঘণ্টা ভন্টুদের ঘরেই থাকে। তিন্নির দুধ খাবার সময় হলে ভন্টু কাঁসর আর তার ঠাকুমা ঘণ্টা বাজাতে থাকেন, আর তিন্নি চোঁ-চোঁ করে দুধ খেতে থাকে। আজও বোতলের দুধ শেষ করে তিন্নি প্রসন্ন মুখে হিগিনকাকুর দিকে তাকাল, তারপর একগাল হেসে বলল, "বুগাগাকি।"

হিগিনকাকু ফস্ করে টেপ-রেকর্ডারের চাবি টিপে বললেন, "সে কী! এর মধ্যে 'ই' আর 'উ' বলতে শুরু করেছে তিন্নি! বল্ তো মা, বল্ তো!"

তিন্নি খানিকক্ষণ নিজের ভাষায় কথা বলল, তারপর রেগে গিয়ে

"জিজিবিজাগিজা" না কী বলে খুব ধমকে দিয়ে মাউথপিসটার ওপরে একটা থাপ্পড় মারল। হিগিনকাকু তখন টেপ-রেকর্ডার বন্ধ করে একটু মনমরা হয়ে বসার ঘরে এসে বসলেন।

ভন্টু বলল, "কাকু, তিন্নির 'ই' 'উ'-র কথা পরে শুনব, তুমি 'অ'-দের কথাই আগে শেষ করো।"

বাবা শুধরে দিয়ে বললেন, "বিদ্রোহী অ-দের কথা।"

হিগিনকাকু একটু অন্যমনস্ক হয়ে বললেন, "কে? কারা? তাদের বাড়ি কোথায়?"

ভন্টু ঠাট্টা করে বলল, "শব্দের গোড়ায়!"

হিগিনকাকু এবার সম্বিৎ ফিরে পেলেন। বললেন, "ও হ্যাঁ। ঠিক বলেছিস—শব্দের প্রথম অক্ষরে অর্থাৎ প্রথম সিলেব্‌লে যে-সব 'অ' 'ও' হচ্ছে না তাদের কথা বলছিলাম তো? এই এদের লক্ষ করো :

'ক্রন্দন' ক্রোন্দন হচ্ছে না।

তেমনি 'ক্রয়' ক্রোয়্ হচ্ছে না। 'হ্রদ' হ্রোদ্ হচ্ছে না।

আবার 'যক্ষ' জোক্‌খো, কিন্তু 'যক্ষ্মা' জক্‌খাঁ। 'লক্ষণ' লোক্‌খোন, কিন্তু 'লক্ষ্মণ' লক্‌খোন; 'গদ্য' গোদ্দো, কিন্তু অনেকের মুখে বা সবসময় 'সদ্যোজাত' শদ্দোজাতো, 'তথ্য' তথ্‌থো।"

'দক্ষ' 'দক্ষতা' কেউ বলে 'দোক্‌খো' 'দোক্‌খোতা', আবার কেউ বলে 'দক্‌খো', 'দক্‌খোতা'। অথচ পক্ষ, বক্ষ, লক্ষ সবই পো-বো-লো-দিয়ে বলছে। 'সদ্য' নিয়েও এরকম সমস্যা আছে। আছে নক্ষত্র [নক্‌খোৎত্রো নোক্‌খোৎত্রো] নিয়ে।

বাবা বললেন, "কারণ?"

হিগিনকাকু বললেন, "কারণ বহুবিধ। পরে তা বলছি। কিন্তু তার আগে যেটা খুব জানা দরকার তা হল, আজ কী রান্না হচ্ছে।"

বিদ্রোহী অ : চতুর্থ দল

"আজ কী রান্না হচ্ছে" প্রশ্নটা শুনে বাবা আর ভন্টু দুজনেই হেসে ফেলল। বাবা বললেন, "তোর কোনো চিন্তা নেই, ঠিকই রান্না হচ্ছে, তোর জিভ বিদ্রোহ করবে না 'অ'-দের মতো।" তখন হিগিনকাকু ভাষাতত্ত্বের কথা বেমালুম ভুলে গিয়ে বিদেশে তাঁর মাস্টারমশাইদের খাদ্যবিলাসিতার গল্প করতে লাগলেন। জিম মেকলি নামে নাকি এক মাস্টারমশাই ছিলেন, মহিষাসুরের মতো গোঁফ তাঁর—চিজ আর বেগুন দিয়ে অসাধারণ একটা তরকারি রান্না করে হিগিনকাকুকে খাইয়েছিলেন একবার। আরেকবার কোন্ পার্টিতে নাকি যা বাকি পড়ে ছিল নানা পাত্রে, সব একাই চেটেপুটে শেষ করে দিয়েছিলেন।

এরমধ্যে কালো কফি এসে গেল নিয়মমতো। তাতে চুমুক দিয়ে হঠাৎ হিগিনকাকু বলে উঠলেন, "গোড়ায় ওই যে বিদ্রোহী 'অ'-গুলো, ওগুলো কেন বদলায় না জানিস ভন্টু? সকলে যে একটা কারণে গোঁ ধরে থাকছে তা নয়। 'ক্রয়', 'হ্রদ'-এর 'অ' অ থাকছে হয়তো 'ও' বলতে আমাদের অসুবিধে হয় বলে। 'যক্ষ্মা' 'লক্ষ্মণ'-এর 'অ'-এর টিকে থাকার কারণ স্পষ্ট নয়, সম্ভবত 'যইক্ষ্মা' 'লইক্ষ্মণ' বলা একটু অসুবিধে বলে। 'মদ্য', 'তথ্য', 'সদ্য', অনেকে 'অ' দিয়ে বলে শব্দগুলো বহুপ্রচলিত নয় বলে, কম লোকে মুখের ভাষায় ব্যবহার করে বলে। খুব চালু হয়ে পড়লে 'ও' চলে আসার সম্ভাবনা আছে এগুলোতেও।

কিন্তু—" একটু ছটফট করতে করতে হিগিনকাকু বললেন। "ব্যাপারটা আর-একটু খতিয়ে দেখতে হবে।"

বাবা বললেন, "এবার শব্দের মাঝখানকার 'অ', মানে যারা বিদ্রোহ করছে 'অ'-ই থাকছে 'ও' না হয়ে, তাদের কথা শুনি।"

হিগিনকাকু বললেন, "তারও বেশ কিছু উদাহরণ আছে। যেমন ধরো 'উদয়', 'হৃদয়', 'বিষয়', 'আশ্রয়।' এগুলোতে 'দ' 'ষ', 'শ্র'-এর সঙ্গে 'ও' এসে যাওয়া উচিত ছিল, কিন্তু আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে 'অ' দিয়ে উচ্চারণ করি।

ভন্টু বলল, "আরো দুয়েকটা শব্দ যেন আছে, যেমন 'নির্ভয়', 'সদয়'।"

বাবা বললেন, "নির্ণয়, প্রণয়, বিলয়, আলয় কিংবা ধরো, **দুর্বল, নিশ্চয়, সংকট, সংগত, বিক্ষত, তদ্‌গত, দুর্গত, বিতর্ক, সম্বল**।"

হিগিনকাকু ধমকে উঠে বললেন, "আরে এ-শব্দগুলোতে 'অ' মাঝখানে কোথায়? 'অ' তো আছে শব্দের গোড়ায়?"

বাবা বললেন, "যাঃ, কী বলছিস! স্পষ্ট দেখছি মাঝখানে, তুই বলছিস গোড়ায়? আমাদের বোকা পেয়েছিস?"

"আহা চটছ কেন? বোঝো জিনিসটা—" হিগিনকাকু বললেন "শব্দগুলোকে ভাঙো। কী পাচ্ছ? নিঃ+দয়, স+দয়, নিঃ+নয়, প্র+নয়, বি+লয়—এইরকম তো? আগে বসেছে উপসর্গ, পরে শব্দটা—তাই না?"

ভন্টু বলল, "হ্যাঁ।"

"ঈশ্বরের দিব্যি দিয়ে বলছি—" হিগিনকাকু গম্ভীর হয়ে বললেন, "বাংলা স্বরধ্বনির উচ্চারণের নিয়মকানুনে উপসর্গ বেচারারা একেবারে ফেকলু, তাদের কানাকড়ি ক্ষমতা নেই। ফলে ওরা নেই বলেই ধরে নাও। তোমাদের শব্দগুলোতে 'অ' গোড়াতেই আছে বুঝতে হবে। তাহলে তারা কেন বদলাবে—হেই কথাখান্ কইতে পারো?

আর এ শব্দগুলোও মন দিয়ে লক্ষ করো। এতে অ আছে আলাদা শব্দে, কিন্তু সন্ধি হয়ে তা আর একটা শব্দের সঙ্গে জুড়ে গেছে। যেমন—কত + দিন > কদ্‌দিন (কোদ্দিন নয়), তত + দূর > তদ্দূর (তোদ্দুর নয়), সৎ + কুল > সৎকুল (শোৎকুল নয়)। এরকম আরও শব্দ—সদ্‌বিপ্র, সৎশূদ্র, তদ্দিন, যদ্দিন।

বাবা ও ভন্টু দুজনেই স্তম্ভিতভাবে মাথা নাড়ল।

অ-এর বিদায়
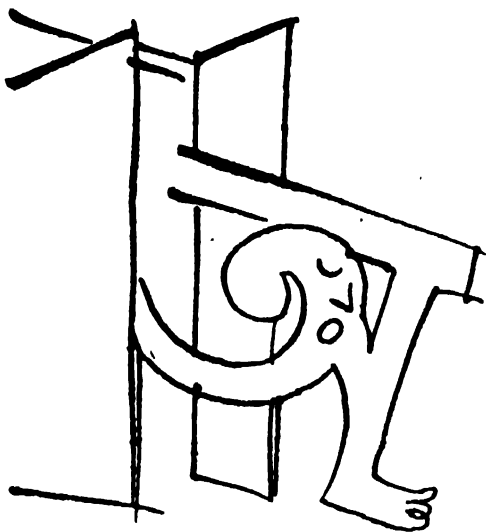
ভন্টু প্রথমে মুখ খুলল, বলল, "কাকু, খালি 'অ'-এর কথাই শুনছি অ্যাদ্দিন ধরে, আর ভালো লাগছে না। আর কিছু নেই তোমার?"

হিগিনকাকু ভন্টুর মাথায় হাত বুলিয়ে বললেন, "বাবাজীবন, 'অ'-কে অবহেলা কোরো না। তুমি ঠিক-ঠিক বাংলা বলতে জান কিনা, তোমার 'অ' দিয়েই তার বিচার হবে। গোঁফ দেখলে যেমন শিকারি বেড়াল চেনা যায়!"

বাবা হেসে বললেন, "তা ঠিক বলেছিস বোধ হয়। তোর সঙ্গে কথাবার্তা বলার পর থেকে আমারও জিনিসগুলো একটু-আধটু নজরে পড়েছে। এখন রেডিয়োতে যখন একজন 'অতুলপ্রসাদ' আর-একজন 'ওতুলপ্রসাদ' বলে, তখন আমি নিজেই বুঝতে পারি, প্রথম জন শব্দের মানে বুঝে 'অ+তুল' ভেবে নিয়ে উচ্চারণ করছে, কিন্তু দ্বিতীয় জনের উচ্চারণই স্বাভাবিক উচ্চারণ। বুঝি 'ওভ্যাস' ঠিক, কিন্তু 'ওব্যাহত' ভুল।"

ভন্টু বলল, "আকাশবাণী দিল্লির একজন বাংলা খবরে কিন্তু রোজই 'ওব্যাহত' বলেন।"

হিগিনকাকু বললেন, "কিন্তু নিয়মটা জানলে তো আর ভুল করার দরকার হয় না।"

বাবা বললেন, "নিয়ম তো জানলাম। কিন্তু একটা ঝামেলা কী জানিস। সব নিয়ম সমান ব্যাপক নয়। এই ধর্, তুই সেদিন বললি শব্দের গোড়ায় 'ম' থাকলে তার উচ্চারণ 'ও' হয়।"

ভন্টু বলল, "ছ-নম্বর নিয়ম কি?"

বাবা বললেন, "অত নম্বর-টম্বর বুঝিনে বাবা! এই ধর্ মহা, মতো, মশা। কিন্তু 'মতো' সকলে 'মোতো' বলছে না। 'মহৎ'-এর 'ম' 'অ'-কেই ধরে রেখেছে।"

হিগিনকাকু বললেন, "তুমি আর কী শোনাচ্ছ মেজদা, আগে বলে থাকতে পারি, আরও একবার বলছি। আরও নানা কেচ্ছা হচ্ছে। 'মন' 'মোন' হচ্ছে, 'মনসিজ' 'মোনোসিজ' হচ্ছে। মনোযোগ 'মোনোজোগ্'ও। কিন্তু 'বন' 'বোন' উচ্চারিত হলেও 'বনানী' (নাম) উচ্চারিত হচ্ছে 'অ'-দিয়ে।" 'বোনানি' নয়। 'অণিমা', 'অরিন্দম', 'অরিজিৎ', 'অতীন' 'অতীশ'? স্বাভাবিক নিয়মে 'ওনিমা', 'ওরিন্দম', 'ওরিজিৎ' 'ওতিন' হচ্ছে না। ভন্টু, তোর খাতাটা দে তো বাবা, একটা লিস্টি করে দিই"—বলে খাতায় লিখলেন—

হচ্ছে	হওয়া উচিত ছিল
অ-ণিমা	ওনিমা [অণু+ইমা]
অ-রিন্দম	ওরিন্দম [অরিম্+দম]
অ-রিজৎ	ওরিজিৎ [অরি+জিৎ]
অ-তীন	ওতিন [অতি+ইন্দ্র>ইন্]
অ-তীশ	ওতিশ [অতি+ঈশ]

'লঘু+ইমা' থেকে পাই 'লঘিমা', উচ্চারণে [লোঘিমা]; কাজেই 'অণু+ইমা' থেকে [ওনিমা]ই হত। 'অরি' 'অতি'-র 'অ' গোড়া থেকেই ও হয়ে আছে, কাজেই 'অরিন্দম', 'অরিজিৎ', 'অতীন' (অতি+ইন্দ্র থেকে) 'অতীশ' (অতি+ঈশ) ও দিয়েই বলা উচিত ছিল। কিন্তু আমরা বেশি চালাক বলে, ওগুলোর অ-টাকে ভেবে নিয়েছি না-মার্কা অ। কাজেই তাকে আর বদলাইনি। আমরা কী ভোম্বল বল্ তো বাবা! অন্যদিকে চেনা নাম বলে 'অতুল'কে করেছি [ওতুল], 'অসুর' (দুর্গামণ্ডপের), অতিথি, অমিয় বলছি [ওশুর], [ওতিথি], [ওমিয়ো]। ওদের গোড়াকার অ-গুলো যে না-মার্কা তা আমাদের আর খেয়ালই নেই। বিশ্রী ব্যাপার। কিন্তু যদি নাম না হয়, বিশেষণ 'অতুল' (জগতে অতুল রূপ), 'অসুর' (সুর নয়, অসুরের বাস এই কণ্ঠে), সেখানে কিন্তু 'অ' হবে, 'ও' হবে না। মনে থাকবে তো ভাইসব?' আবার যেখানে হওয়ার জন্য মাথার দিব্যি দেয়নি কেউ, সেখানে 'কর্তব্য' হচ্ছে 'কোর্তোব্বো', 'বক্তব্য' হচ্ছে 'বোক্তোব্বো', 'গন্তব্য' হচ্ছে 'গোন্তোব্বো'। কিন্তু এগুলো ভুল। **ঠিক উচ্চারণ হল কর্-তোব্‌বো, বক্-তোব্‌বো, গন-তোব্‌বো, পদ্-ধোতি ('পোদ্ধোতি' নয়)।** সম্-পোত্তি

(শোম্-পোত্তি' নয়)। আগেও একবার বলেছি এসব কথা। আবার দ্যাখো 'শ'—এই কথাটা শব্দের গোড়ায় থাকলে 'অ' পাচ্ছে, যেমন 'শ-খানেক' কিন্তু আগে কিছু জুড়লেই 'ও' তাকে দখল করছে, যেমন 'এক-শো', 'তিন-শো'।"

বাবা বললেন, "তবে তো মুশকিল।"

"না, মুশকিল কিসের আর। কোনো নিয়ম ভুল, কোনো নিয়ম গরিব—দু-চারটে শব্দের বেশি দখল করতে পারেনি; আবার কোনো নিয়ম সসাগরা ধরণীর একচ্ছত্র সম্রাট— কোনো শব্দকেই ছাড়ান দেয় না।" এই বলে হিগিনকাকু শ্লোগানের মতো করে চেঁচিয়ে উঠলেন, "নিজের ভাষার নিয়মগুলোকে—জানতে হবে, জানতে হবে!"

বাবা বললেন, "কী কাণ্ড, অ্যাঁ!"

হিগিনকাকু বলে উঠলেন, "হ্যাঁ—অ্যা, এইবার 'অ্যা'-এর পালা।"

'বেঙ্' আর 'ভ্যাক্'

"তা অ্যা-কে নিয়ে কী ধরনের সমস্যা?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

হিগিনকাকু বললেন, "ভয়ানক সমস্যা, মারাত্মক সমস্যা। যারা বাংলা স্ট্যান্ডার্ড ভাষা বলে, তারা হয়তো ঠিক-ঠিক জানে কোথায় 'অ্যা'-এর উচ্চারণ হবে। কিন্তু তুমি-আমি তো বাঙাল—আমরা কি জানি?"

ভন্টু বলল, "কেন কাকু, বানান দেখে বুঝতে পারো না?"

"হা রে পোলাপান, ধোতি টিলি-ঢালি ভাত-খাউয়া বঙ্গালী—" বলে হিগিনকাকু একই নিশ্বাসে পুব-বাংলার শব্দ আর উত্তরভারতে বাঙালিদের ঠাট্টা করে বলা প্রবাদ আউড়ে বললেন, "তোকে এতক্ষণ বোঝালাম কী? দশ-রকম বানান আছে অ্যা-এর—এ, ে, ে, অ্যা, এ্য, এ্যা, ্য, ্যা, য়্যা, া। তাই তো?"

ভন্টু মাথা নেড়ে 'হ্যাঁ' বোঝাল।

"খাতা দে, লিখে দেখাচ্ছি", বলে আবার খাতায় লিখলেন—

বানান		উচ্চারণ
এ দিয়ে	এক	অ্যাক্
ে (মাত্রাহীন এ-কার)	গেল	গ্যালো

ে (মাত্রাওয়ালা এ-কার)	খেলা (বিশ্বভারতীর বইয়ে)	খ্যালা
অ্যা	অ্যাসিড	অ্যাসিড
এ্য (ভুল, অনেকেই তবু লেখেন)		
এ্যা (এও ভুল, কেউ কেউ লেখেন)	এ্যাটলাস	
্য	ব্যয়	ব্যায়্
্যা	খ্যাত	খ্যাতো
য়্যা	য়্যাটকিনসন (বিষ্ণু দে লিখেছেন)	
া	জ্ঞান	'গ্যাঁন্'

"এখন দ্যাখো", হিগিনকাকু তার খাতাটা টেনে দেখাতে লাগলেন, "এর মধ্যে যখন অ্যা, এ্য, এ্যা, ্য, ্যা, য়্যা—এমনকি জ্ঞ-এর সঙ্গে া দিয়ে 'অ্যা' ধ্বনি বোঝাচ্ছে হচ্ছে—তখন দেখছি ঠিক আছে। এগুলোতে পরিষ্কার অ্যা-ই বোঝানো ধরে নাও—কেউ এগুলোর 'এ' উচ্চারণ করবে না অন্তত। কিন্তু যেগুলো এ আর ে দিয়ে লেখা? ডিকশনারি খুলে দ্যাখো, বেশির-ভাগ অ্যা-ওয়ালা শব্দ এ আর ে দিয়ে লেখা। আমরা বাঙালরা কী করে বুঝব ওই 'এ/ে' কোথায় 'এ' বোঝাবে, আর কোথায় 'অ্যা'? ত্রিপুরা, শিলচর, করিমগঞ্জে তো এখনও লেখে বেঙ্ক্ (bank), বেট্ (bat), বেন্ড্পার্টি (bandparty)। বিদেশিরা কী করে বুঝবে—যারা বাংলা পড়তে শিখছে?"

ভন্টু এবার মাথা নাড়তে সাহস পেল না।

ভন্টুর বাবা বললেন, "কিন্তু, 'এ' লেখা থাকলে যেখানে 'এ' উচ্চারণ হবে, সেখানেও তো ভুল করে অনেক। তোর মনে নেই হিগিন, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত খুব সুন্দর বক্তৃতা করতেন, কিন্তু 'অ্যাবং' বলতেন ফলে—"

হিগিনকাকু বললেন, "আর বোলো না, ওই 'অ্যাবং'-টা ছিল তাঁর ভাষায় একমাত্র গণ্ডগোল—সব ঠিকঠাক বলে শুধু এবং-এ এসে আছাড় খেতেন। তাহলে বলি শোনো আর-একজন অধ্যাপকের গল্প। তাঁরও বাড়ি বাংলাদেশের পুবদিকের এক জেলায়। ক্লাসে পড়াচ্ছেন, 'মত্ত দাদুরী ডাকে ডাহুকী ফাটি যাওত ছাতিয়া'—বিদ্যাপতির কবিতা। একটি ছাত্র উসখুস করছে দেখে তিনি থামলেন বললেন, 'কী হয়েছে বাবা?' তখন ছাত্রটি ফস্ করে বলল, 'স্যার, দাদুরী মানে কী স্যার?' স্যার তো খুব বিরক্ত, সাহিত্যের ক্লাসে এ-কথাটার মানে সকলেরই জানা উচিত। তবু বিরক্তি চেপে বললেন, 'দাদুরী হল ভ্যাক্।' সমস্ত ক্লাস নিস্তব্ধ। ছাত্রটি মরিয়া হয়ে বলল, 'কিন্তু স্যার ভ্যাক্ কাকে বলে?' অধ্যাপক এবার খুব বিরক্ত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'এমন নির্বোধ ক্লাসে কি পড়ানো যায়? ভ্যাক্ কী তাও জানে না। ভ্যাক্ হচ্ছে বেং!' ব-এর পরে এ দিয়ে উচ্চারণ করে তিনি বেরিয়ে গেলেন।"

হাসি থামলে বাবা বললেন, "'অ্যা'-ও দেখছি একটা বিচ্ছু স্বরধ্বনি।"

ছদ্মবেশী অ্যা

ভন্টু বলল, "তাহলে কাকু, কী করে বুঝব কোথায় 'অ্যা' হচ্ছে, কোথায় 'এ'?"

হিগিনকাকু মাথা ঝাঁকিয়ে বললেন, "এই হল গিয়ে কতা! সমস্যাটা মূলত হল আমাদের, বাঙালদের।"

বাবা একটু ক্ষুণ্ণ স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, "শুধু বাঙালদের?"

হিগিনকাকু আশ্বাস দেবার মতো করে বললেন, "আহা, মন খারাপ করছ কেন? বাঙাল বলতে আমি কি শুধু আমার-তোমার মতো ঢাকার বাঙাল বোঝাচ্ছি? তা কেন হবে? বাঙাল মানে যারা বাংলা স্ট্যান্ডার্ড বা মান্য ভাষার নিয়মকানুন এখনও ঠিক রপ্ত করতে পারেনি, যারা নন-স্ট্যান্ডার্ড উপভাষা বা ডায়ালেক্ট শিখেছে মাতৃভাষা হিসেবে। সেদিক থেকে তুমি মেদিনীপুর বা বীরভূমের লোককেও বাঙাল বলতে পারো। এমন যারা আছি আমরা—ডায়ালেক্ট-ভাষী—তারা অনেকেই জানি না কোথায় 'অ্যা' হবে, কোথায় 'এ'। মেদিনীপুরের লোকেরা বলে 'অ্যাকটি', যেখানে হবে 'একটি'।

ভন্টু বললে, আরও দু-একটা উদাহরণ দিয়ে বোঝাও না।"

"আরে বাপু, উদাহরণ তো তোমার পেছনেই আছে।" হিগিনকাকু বললেন।

ভন্টু পেছন ফিরে তাকাল। বাবাও সেদিকে তাকিয়ে বললেন, "কই, ভন্টুর পেছনে কী উদাহরণ আছে বললি?"

হিগিনকাকু গম্ভীরভাবে বললেন, "কেন, 'ল্যাজ'! নেই ওটা ওখানে?"

বাবা হো-হো করে হেসে উঠলেন। ভন্টু খুউব রেগে গিয়ে হিগিনকাকুর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়তে গেল, হিগিনকাকু তাকে জাপটে ধরে সোফায় বসিয়ে দিয়ে বললেন, "আহা, আহা, বৈজ্ঞানিক আলোচনায় এ-রকম মেজাজ গরম করতে নেই।" বলে বাবার দিকে তাকিয়ে যেন কিছুই হয়নি ভাব করে বলতে লাগলেন, "'ল্যাজ'-এর মুশকিল কী জানো? কথাটা লেখা হয় সাধারণত এ-কার দিয়ে—'লেজ'। এখন বাংলায় 'এ' হোক আর 'এ-কার' হোক—দুজনেই বেশ দুমুখো নীতি নিয়ে চলে—তারা উচ্চারণে কখনো 'এ', কখনো 'অ্যা'। ফলে আমরা বাঙালরা ধরতে পারি না 'এ' বা 'এ-কার' থাকলে কোথায় 'অ্যা' বলব। আমারই একটা কেচ্ছা শোনো। এম. এ. ক্লাসে একটা নাটক করেছিলাম মনে আছে। তাতে আমার মুখে 'দ্যাওয়া' 'ন্যাওয়া' (হবে তো দেওয়া নেওয়া) শুনে ক্লাসের মেয়েরা যা হেসেছিল, তোমাকে কী বলব।"

বাবা বললেন, "তাহলে এবার উপায় বাতলাও। ওই যেখানে-যেখানে 'অ্যা' বসে আছে 'এ' বা 'এ'-কার'-এর ছদ্মবেশ পরে, তাদের ধরব কী করে?"

"হ্যাঁ, যেখানে ছদ্মবেশ নেই, সেখানে ঝামেলা নেই। য-ফলা থাক, য-ফলায় আ-কার থাক, ভুল বা কিন্তু বানানে এ-য় য-ফলা বা এ-য় ্য-ফলা আ-কার থাক—আমরা মোটামুটি ধরতে পারি ওখানে 'অ্যা' হবে। কিন্তু 'এ' আর 'এ-'কার' ই গণ্ডগোল পাকায়। 'পেঁচা' দ্যাখো, 'বেলা' দ্যাখো, এমনকি 'দেখা' দ্যাখো। অবিশ্যি বিদেশি বা নতুন শব্দে, কিংবা ধ্বন্যাত্মক শব্দে তারা ্য-ফলায় আ-কার দিচ্ছে কিন্তু পুরোনো শব্দে ছদ্মবেশ থেকেই যাচ্ছে।"

ভন্টু বললে, "এবার ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দাও তাহলে 'অ্যা'-এর।"

হিগিনকাকু বললেন, "বেশ কথা। চালাও পানসি বেলঘরিয়া!"

ক্রিয়াপদের ঝুড়ি

হিগিনকাকু বললেন, "সমস্যাটা ধরতে পারছ তো ভন্টু, বড়দা? কোথায় 'এ' হবে আর কোথায় 'অ্যা' হবে—তাই নিয়ে গণ্ডগোল। বানানে 'এ' বা 'এ-কার' থাকলেই এই সমস্যা।"

ভন্টুর বাবা বললেন, "[অ্যা] আর [এ]-র উচ্চারণের তফাতটা আরেকবার বলবি?"

"উদীয়মান ভাষাবিজ্ঞানী, তুমি এর জবাব দাও—" বলে হিগিনকাকু ভন্টুর দিকে তাকালেন। ভন্টু একটু চোখ-মুখ কুঁচকে ভেবে খাতার পাতা উলটে বলল, "[এ]-র বেলায় জিভ সামনে এগোচ্ছে, মাঝখানে ওপরের দিকে থাকছে, [অ্যা]-র বেলায় জিভ সামনে এগোচ্ছে, তবে মাঝখানে নীচের দিকে থাকছে।"

"ওয়াহ্ গুরুজিকি ফতেহ!" বলে হিগিনকাকু বললেন, "এবার দুটি ঝুড়ি দুপাশে রাখো। মানে মনে-মনে রাখো। একটি ঝুড়ির গায়ে লিখে দাও 'ক্রিয়াপদ', আরেকটা ঝুড়ির গায়ে লেখো 'অন্যান্য ভদ্রমহোদয়' —যার মধ্যে পড়ছেন বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ ইত্যাদি। রেখেছ দুটো ঝুড়ি?"

ভন্টুর বাবা চোখ বুজে মৃদু হেসে বললেন, "মঞ্জুর! রাখলাম।" হিগিনকাকু বললেন, "ক্রিয়াপদের ঝুড়িটা তুমি বরং ভন্টুকে দাও, আর অন্যটা নিজে রাখো।"

বাবা এবার একটু অধৈর্য হয়ে বললেন, "আঃ আসল কথাটা বলবি তো?"

হিগিনকাকু হাত তুলে বললেন, "বলছি! বলছি! এবার দ্যাখো, ভন্টুর ঝুড়িতে, অর্থাৎ 'ক্রিয়াপদ' লেখা ঝুড়িতে আমি শব্দ বা ওয়ার্ড ছুঁড়ে দিচ্ছি একটার পর একটা। সবগুলোই ক্রিয়াপদ, সবগুলোরই শুরু [অ্যা] ধ্বনিটা দিয়ে, বানানে এ বা এ-কার থাক আর না-ই থাক। আমি বলার সঙ্গে সঙ্গে নামতা-পড়ার মতো তোমাদেরও বলতে হবে। ভন্টু, ঝুড়িটা তুলে ধর্ বাবা মনে-মনে, ধর্ ক্রিয়াপদগুলোকে—"

নামতা-পড়ার মতো ভন্টুর কাল্পনিক ঝুড়িতে যে-সব **ক্রিয়াপদ** এসে পড়তে লাগল সেগুলো এই—এড়ানো এলানো, **খেপা,** খেপানো, **খেলা,** খেলানো, খেঁকানো, গেঁজানো, ঘেঙানো, **ঘেঁষা,** চেঁচানো, **ছেঁকা,** ঝেঁটানো, **টেঁকা** (টেকা), **টেঁকানো** (টেকানো), **ঠেকা,** ঠেকানো, তেলানো, **দেখা,** দেখানো, নেঙ্‌চানো, পেঁচানো, **ফেলা,** ফেলানো, **বেঁকা,** বেঁকানো, **বেচা,** বেচানো, **বেড়া,** বেড়ানো, বেলা (লুচি)—, ভেঙ্‌চানো, মেলা (চোখ—), **লেপা,** লেপানো, লেলানো, **সেঁকা,** সেঁকানো, **হেরা,** (কবিতায়), **হেলা,** হেলানো।" লিস্টি শেষ হলে ভন্টুর বাবা বললেন, "বাপ্‌স!"

"তবে মনে রেখো, এই অ্যা আবার কখনও কখনও ক্রিয়ার অন্যান্য রূপে এ-ও হয়ে যায়। যেমন 'বেড়ানো', 'বেড়ায়' শুরু অ্যা দিয়ে, কিন্তু 'বেড়িয়ে' শুরু হচ্ছে এ দিয়ে।"

হিগিনকাকু আরও বললেন, "এগুলোতে [অ্যা] স্বরধ্বনি যে আছে গোড়ার দিকে তা সবাই জানে। কিন্তু ক-জন আমার মতো বাঙাল জানে যে, 'দ্যাওয়া' হবে 'দেওয়া' বা 'দেয়া' ; কিংবা 'ন্যাওয়া' নয়, 'নেওয়া' বা 'নেয়া'?"

বাবা বললেন, "শাব্বাশ! এইগুলোই চাই!"

হিগিনকাকু বললেন, "তাহলে মনে রাখো আরও—'যাওয়া' ক্রিয়াপদে 'গেছ' নয়, 'গ্যাছ' [গ্যাছো]; 'গেছে' নয়, 'গ্যাছে'; 'গেছেন' নয়, 'গ্যাছেন', 'গেল' নয়, 'গ্যালো'। অন্যদিকে 'গ্যালে' হবে না, হবে 'গেলে'।

এবার ভন্টু আর বাবা দুজনেই বললেন, "বাপ্‌স!"

চুপচাপ ঘাপটি মেরে

ভন্টু একটু অভিমান করল, “কাকু, তুমি হড়বড় করে একগাদা ক্রিয়াপদ আউড়ে গেলে, এত কি মনে থাকে? মাথা কী রকম ঝিমঝিম করছে!”

বাবা বললেন, “তাছাড়া তোর লিস্টের অনেকগুলোই অবান্তর। ধর্‌ ‘বেড়ানো’ এই ক্রিয়াপদটা। এটার গোড়ায় য়্যা [অ্যা] উচ্চারণ হবে—তা নিয়ে বাঙালদেরও কোনো ঝামেলা নেই। আমরাও বলি ‘ব্যাড়ানো’, ‘বেড়ানো’ বলি না। আসলে খুঁজে বার করতে হবে সেই সব ‘এ’ বা ে-কারকে, যারা আসলে ছদ্মবেশী ‘অ্যা’, চুপচাপ ঘাপটি মেরে বসে আছে। অন্যদিকে আমাদের বাঙালদের জন্যে একটা আলাদা রাস্তা দেখাতে হবে। বলতে হবে, দ্যাখো, অনেক জায়গায় এ/ে-কার দেখলে তোমাদের ‘অ্যা’ বলে ফেলার ঝোঁপ হবে। সেখানে সেটা সামলে নিয়ে ‘এ’-ই উচ্চারণ করতে হবে।” একটানা এতটা বলে ভন্টুর বাবা একটু লজ্জা পেলেন, বললেন, “যাচ্চলে! কী রকম বক্তৃতা দিয়ে ফেললাম একটা।”

হিগিনকাকু চোখ বড়ো-বড়ো করে বললেন, “পায়ের ধুলো দাও মেজদা, দারুণ বুঝিয়েছ সমস্যাটাকে।” বলে খুব উৎসাহ নিয়ে শুরু করলেন, “প্রথমে তাহলে ক্রিয়াপদগুলোকেই ধরি, কেমন? ভন্টু, তোর ঝুড়িটা এগিয়ে ধর্‌। ‘অ্যা’-ওয়ালা ক্রিয়াপদগুলোকে চেনবার একটা খুব সহজ উপায় আছে। সেগুলোর সাধারণ বা নিত্য বর্তমানের রূপ ‘অ্যা’ দিয়ে। যেমন—

সে খেলা দেখে [দ্যাখে]
সে খুব চেঁচায় [চ্যাচায়]
দিদি লুচি বেলে [ব্যালে]
লোকটা নেঙচায় [ন্যাঙচায়]

এই ক্রিয়াগুলোই আবার অনেক জায়গায় 'অ্যা'-কে ফেলে দিয়ে 'এ'-কে ডেকে নেয়। অর্থাৎ যা গোড়ায় ছিল 'অ্যা', তাই হয়ে যায় 'এ'। যেমন—

সে খেলা **দেখে** খুশি হয়নি
সে **চেঁচিয়ে** পাড়া মাত করল
দিদি লুচি **বেলে** রেখে ঘুমোতে গেল
লোকটা **নেঙচে-নেঙচে** দৌড়োচ্ছে।

কাজেই কোন্ ক্রিয়ার গোড়ায় 'অ্যা' আছে তা নির্ভুল জানতে হলে লক্ষ করো তার বেলায় ওই ওপরের জায়গাতে 'এ' হচ্ছে কি না। হলেই বুঝবে, ইনি আসলে ঘাপটি 'অ্যা'। 'বেচা'-তে যে 'অ্যা' আছে আমরা বাঙালরা তো খুব কমই জানি। এমন-কি 'বেচারি/বেচারা'তেও যে 'ব্যা'—তা ক-জন জানি?

ভন্টু বলল, "আর যেখানে সত্যি-সত্যি 'এ' আছে?"

হিগিনকাকু বললেন, "বেঁচে থাকো। সেখানে ওই ওপরের জায়গায় 'এ' হয়ে যায় 'ই'। যেমন কেনা, লেখা, মেশা, লেখানো, মেশানো, ঘেরা ইত্যাদির বেলায়;

সে বইটা **কিনে** (কেনা) খুশি হয়নি
সে দাদাকে দিয়ে দরখাস্ত **লিখিয়ে** (লেখানো) নিলে
দিদি দুধে কফি **মিশিয়ে** (মেশানো) খাচ্ছে
চারটে ডাকাত আমাকে **ঘিরে** (ঘেরা) ধরল।

অর্থাৎ 'এ'-ওয়ালা ক্রিয়াপদ যেখানে 'ই' উচ্চারণ পাচ্ছে, ঠিক সেই জায়গায় 'অ্যা'-ওয়ালা ক্রিয়াপদ পাচ্ছে 'এ' উচ্চারণ। দুয়ের এই তফাতটা খেয়াল রাখো।"

তারা বহুরূপী

ভন্টুর বাবা বললেন, "বেশ তো! অ্যা-ওয়ালা ধাতু হলে তা কোথাও-কোথাও এ-ওয়ালা হয়ে যাচ্ছে। 'দ্যাখা' হচ্ছে 'দেখে', 'খেলা' [খ্যালা] হচ্ছে 'খেলে', 'চ্যাঁচানো' হচ্ছে 'চেঁচিয়ে'। কিন্তু এ-ওয়ালা ক্রিয়ার ধাতু হচ্ছে ই-ওয়ালা—।"

ভন্টু উদাহরণ জুগিয়ে দিলে—'শেখা' থেকে 'শিখে', 'কেনা' থেকে 'কিনে', 'মেশানো' থেকে 'মিশিয়ে'।

"অত্যুত্তম পর্যবেক্ষণ!" হিগিনকাকু খুশি হয়ে বলে উঠলেন, "বড়দা, ভন্টু, তোমাদের উভয়ের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল! তবে এটা লক্ষ কোরো যে, ওই 'অ্যা' ধাতুরূপের বেশিরভাগ জায়গাতেই 'এ' হয়ে যাচ্ছে। যেমন ধরো 'বেচা' এই ক্রিয়ার ধাতু হল 'বেচ্' [ব্যাচ্]। এখন 'অ্যা' পাচ্ছি শুধু এই কটা রূপে— (তুমি) বেচো [ব্যাচো], (তুই) 'বেচ্' [ব্যাচ্], (সে) 'বেচে' [ব্যাচে], (আপনি/তিনি) বেচেন [ব্যাচেন], বেচা [ব্যাচা]। কিন্তু এ-ওয়ালা [বেচ] পাচ্ছি আর সব জায়গায়। সমাপিকা-অসমাপিকা ধরে এই ক্রিয়ার ৪৭টা রূপ পাচ্ছি সবসুদ্ধ।"

ভন্টুর বাবা বললেন, "বাপ্‌স!"

হিগিনকাকু বললেন, "অবাক হলে 'বাপ্‌স' ছাড়া অন্য কোনো মন্তব্য নেই?"

বকুনি খেয়ে বাবা থতমত খেলেন, বললেন, "না না, মানে, টের পাই না

তো এতগুলো রূপ আছে আমাদের ক্রিয়াপদের!"

হিগিনকাকু বললেন, "মুখে বলছ ভাষাটা, আর টের পাচ্ছ না কী বলছ—ইয়ারকি পেয়েছ, না? দ্যাখো কী করে সাতচল্লিশটা হচ্ছে।" বলে ভন্টুকে বললেন, "আঙুলের কর গোন্ তো—" বলে গড়গড় করে আউড়ে গেলেন—

"বেচি, **বেচো**, [ব্যাচো], বেচিস, **বেচে**, [ব্যাচে], **বেচেন**; [ব্যাচেন] ; বেচছি, বেচছ, বেচছিস্, বেচছে, বেচছেন; বেচেছি, বেচেছ, বেচেছিস, বেচেছে, বেচেছেন—এই হল এক পত্তন," বলে একটু দম নিলেন, তারপর আবার এক নিশ্বাসে—"বেচলুম, (বেচলাম), বেচলে, বেচলি, বেচল, বেচলেন ; বেচছিলুম, বেচছিলে, বেচছিলি, বেচছিল, বেচেছিলেন ; বেচেছিলুম, বেচেছিলে, বেচেছিলি, বেচিছিল, বেচেছিলেন; বেচতুম, বেচতে, বেচত, বেচতিস, বেচতেন।—এই গেল আরেক প্রস্থ।" বলে একটানা শেষ করলেন—"বেচব, বেচবে, বেচবি, বেচবেন ; বেচুন, [ব্যাচো], বেচো, বেচুক ; বেচে, বেচলে, বেচতে, বেচা [ব্যাচা]। এর মধ্যে অ্যা-ওয়ালা হল কটা রূপ? পাঁচটা মাত্র।"

ভন্টু বলল, "কিন্তু কাকু, বাকি বিয়াল্লিশটায় নেই কেন সে অ্যা? পালল কোথায়?"

হিগিনকাকু জ্ঞানী-জ্ঞানী ভাব করে বললেন, "পালাবে কেন, তা ওই 'এ' হয়ে গেছে।"

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "তাই বা হবে কেন?"

হিগিনকাকু এবার বিরক্ত হলেন, "কেন? ওই যে পরে ই/উ আছে? তারাই তো চুলের মুঠি ধরে 'অ্যা' কে 'এ'-তে তুলে দিচ্ছে। স্বরধ্বনির দড়ি-টানাটানির কথা আগে বলেছি না।?"

ভন্টু তাজ্জব হয়ে বলল, "তার মানে অ-কে যারা 'ও' করছে তারাই 'অ্যা'-কে 'এ' বানিয়ে দিচ্ছে?"

হিগিনকাকু সায় দিয়ে চোখ টিপলেন।

ধাতুর সেদ্ধপোড়া

ভন্টু জিজ্ঞেস করল এবার, "তাহলে কাকু, আমাদের ক'টা ক্রিয়াপদ আছে ওই অ্যা-ওয়ালা?"

হিগিন চোখমুখ কুঁচকে তাকেই ফের জিজ্ঞেস করলেন, "কোন্ জাতের ক্রিয়া—সিদ্ধ, না সাধিত?"

ভন্টুর বাবা ঠাট্টা করে বললেন, "ক্রিয়াপদ কি কাঁচকলা, যে সেদ্ধ হবে? এসব কী বলছিস তুই?"

কাঁচকলা শুনে রেগে না গিয়ে হিগিনকাকু এবার পুরোপুরি চোখ বুজে ফেললেন, বললেন, "আঃ, সেদিন বউদি কাঁচকলার কোফতাটা দারুণ রেঁধেছিলেন—কোত্থেকে যে শেখেন এ সব!" —আরও কী বলতে যাচ্ছিলেন খাবার-দাবার নিয়ে, এমন সময় কী জন্যে যেন তিন্নির কান্না শোনা গেল—অ্যাঁ—অ্যাঁ—অ্যাঁ, ফলে হিগিনকাকু আবার 'অ্যা'-তে ফিরে এলেন। বললেন, "আরে তোরা! এটাও জানো না? বাংলায় যে-ক্রিয়ার মূল বা ধাতু এক সিলেব্‌লের—যেমন যা কর্ খা দেখ্ শোন্—এগুলো হল সিদ্ধ ধাতু। অর্থাৎ আগে থেকেই তৈরি হয়ে গেছে। আর যেগুলো একের চেয়ে বেশি সিলেব্‌লের, অর্থাৎ 'দেখানো'র 'দেখা', 'ঝনঝনানো'র 'ঝনঝনা', 'সাঁতরানো'র 'সাঁতরা' সেগুলো সব

সাধিত ধাতু, অর্থাৎ সেগুলো অন্যভাবে তৈরি করা হয়েছে।" বলতে বলতে বাবার ও ভন্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেলেন, "ঝামেলা হচ্ছে নাকি কিছু?"

বাবা মুখ কাচুমাচু করে বললেন, "মানে ওই 'ধাতু' ব্যাপারটা যদি একটু ধরিয়ে দিস দাদা!"

হিগিনকাকু কপাল চাপড়ে "হা ঈশ্বর, মাইন গঠ্ মঁ দ্যো, অ্যায় খুদা" এই সব নানা ভাষায় 'হা ভগবান!' কথাটা উচ্চারণ করে বললেন, "ধরো—এই 'ধরো' কথাটা। এতে পাচ্ছি 'ধর্' একটা অংশ, আর 'ও' একটা অংশ। 'ধর্'টা হল ধাতু, আর 'ও'টা হল বিভক্তি। 'করেছিলুম'-এ 'কর্' হল ধাতু, আর এছ্-ইল-উম এই তিনটি হল বিভক্তি। **পুরো ক্রিয়ার বিভক্তি বাদ দিলে যেটা বাকি থাকে তাই হল ধাতু।**"

বাবা বললেন, "ব্যস ব্যস। পরিষ্কার! এবার অ্যা-ধারী ক্রিয়াগুলোর কথা বলো।"

হিগিনকাকু বললেন, "সিদ্ধ ধাতুর মধ্যে নামজাদা এই কটা হল অ্যা-ওয়ালা—শেষে আ-কার, দিয়ে বললে বুঝতে সুবিধে হবে—খেপা [খ্যাপ্], খেলা [খ্যাল্], ঘেঁষা [ঘ্যাঁষ্], ঠেলা [ঠ্যাল্], দেখ [দ্যাখ্], ফেলা [ফ্যাল্], বেড়া [ব্যাড়্], বেলা [ব্যাল্], মেলা [ম্যাল্], লেপা [ল্যাপ্], সেচা [স্যাচ্], হেরা [হ্যার্], হেলা [হ্যাল্] 'বেচা' তো আগেই বলেছি। লক্ষ কোরো 'বেচা'র যেখানে যেখানে 'অ্যা' হচ্ছে সেই পাঁচটি জায়গায় এগুলোতেও 'অ্যা' হবেই হবে—তার অন্যথা হবে না।"

ভন্টু বলল, "আবার লিস্টি! বাপস! মা, তিন কাপ—"

ভন্টুর মা আড়াল থেকে সাড়া দিয়ে বললেন, "কালো কফি? আসছে।"

হিগিনকাকুর ব্যা-ব্যা
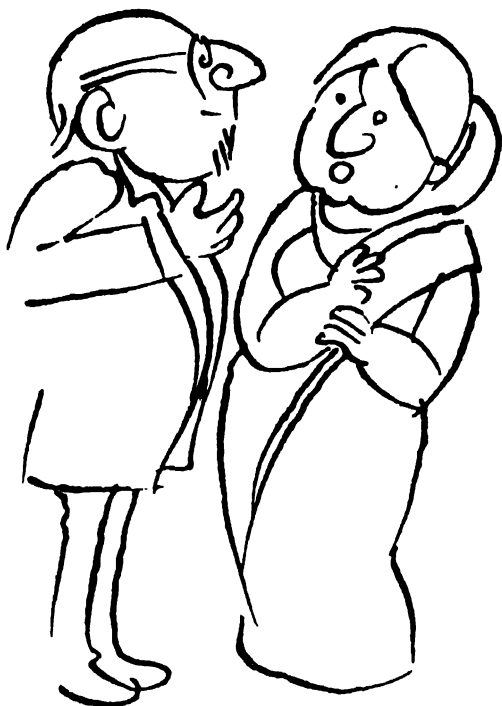
পরের ছুটির দিনটায় হিগিনকাকু ঠিক ঘড়ির কাঁটায়-কাঁটায় আটটায় এসে পৌঁছোলেন। ভন্টুও খাতাপত্র নিয়ে বসবার ঘরে হাজির। বাবা দাড়ি কামাচ্ছিলেন। রাধা হিগিনকাকুর জন্যে কালো আর বাবার জন্যে সাদা কফি দিয়ে গেল, ঠাম্মা এসে উঁকি দিয়ে বললেন, "নানু (হিগিনকাকুর ডাকনাম) আইছস?" তারপরে বাবার কফি জুড়িয়ে যাচ্ছে দেখে ডেকে বললেন, "কোকা রে, তর্ কফি দ্যাওয়া অইসে।"

'কোকা' মানে খোকা, মানে ভন্টুর বাবা কিছু উত্তর দেবার আগেই হিগিনকাকু উঠে ঠাম্মার পায়ে ঢিপ করে এক প্রণাম। ঠাম্মা 'করস কী, বাইচ্যা থাক্' বলে একটু থতমত খেয়ে চলে গেলেন। হিগিনকাকু একদৃষ্টে গম্ভীর মুখে তাঁর দিকে খানিকটা তাকিয়ে থেকে আবার সোফায় এসে বসলেন, ভন্টুকে জিজ্ঞেস করলেন, "ওই বৃদ্ধাকে হঠাৎ প্রণাম করলুম কেন বল্ তো?"

ভন্টু আজকাল হিগিনকাকুর এসব কাণ্ডে ঘাবড়ায় না। সে বলল, "তুমিই জানো।"

হিগিনকাকু বললেন, "না রে, ভদ্রমহিলা বেশ ঘাপটি আছেন। সেদিন 'বেহিসেবি' ক্রিয়াপদে কোথায় 'অ্যা' হয় বলছিলুম তো? লিস্টিটা বলে যা তো!"

ভন্টু, ছড়ার মতো গড়গড়িয়ে বলে গেল—

মিছে করো ঘ্যান ঘ্যান,
দেয়-নেয়, দেন-নেন,
গেছেন, গেছ ও গেছে
গেল-তে হবে যে 'অ্যা';
ভুলে গেলে ডাক ছাড়ো
ব্যা—ব্যা—ব্যা—ব্যা!"

হিগিনকাকু হাততালি দিয়ে বলে উঠলেন "বাহবা, বাহবা! এই অপূর্ব কাব্যটি কার রচনা?"

ভন্টু বলল, "বাবার!" এর মধ্যে বাবা এসে পড়েছেন, হিগিনকাকু তাঁকে 'গ্রাসিয়াস্' অর্থাৎ স্প্যানিশ ভাষায় 'থ্যাঙ্ক ইয়ু' বলে বললেন, "জানিস ভন্টু, আমাকেও বোধহয় ব্যা-ব্যা ডাক ছাড়তে হবে। ওই উদাহরণগুলোর মধ্যে আমি 'দেওয়া' আর 'নেওয়া' এ দুটো কথা সম্বন্ধে সাবধান করতে ভুলে গেছি। মামিমা বললেন, 'কফি দ্যাওয়া অইসে'! তক্ষুনি আমার মনে পড়ল ওটা 'দেওয়া' হবে, দ্যাওয়া নয়।"

হিগিনকাকু বললেন, "ভন্টু, খাতায় লেখো—

'গ্যাছো' হবে, 'গেছো' হবে না
'গ্যাছে' হবে, 'গেছে' হবে না
'গ্যাছেন' হবে, 'গেছেন' হবে না
'গ্যালো' হবে, 'গেলো' হবে না।

আর, 'দ্যায়', 'ন্যায়', 'দ্যান', 'ন্যান' হবে উচ্চারণে, 'দেয়', 'নেয়', 'দেন', 'নেন' হবে না। কিন্তু বাবা, অন্যদিকে—

'গেলে' 'গেলেন' হবে, 'গ্যালে' 'গ্যালেন' হবে না।

'দেওয়া' 'নেওয়া' হবে, 'দ্যাওয়া' 'ন্যাওয়া' হবে না।"

বাবা বললেন, "বেশ, তোকে ব্যা-ব্যা, ডাক ছাড়তে হবে না তাহলে আর।"

কফি খাবার পর হিগিনকাকু আজকের মতো উঠি-উঠি করছিলেন, বাবা বললেন, "কিন্তু একটা কথা তো বাকি রয়ে গেল! অ্যা-ওয়ালা সিদ্ধ ধাতুর ওই পাঁচ জায়গায় 'অ্যা' থেকে যাচ্ছে বললি, কিন্তু সাধিত ধাতুর বেলায় কী হচ্ছে রে?"

হিগিনকাকু সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে বললেন, "থ্যাঙ্ক ইউ, এটা না বলে গেলে রাত্রে আমার ঘুম হত না। শোনো, বেশিরভাগ জায়গায় অ্যা-ওয়ালা সাধিত ধাতুর বেলায় 'অ্যা' থাকছে। আরও কম জায়গায় 'অ্যা' 'এ'-কে জায়গা ছেড়ে দিচ্ছে। ধরো 'দেখানো'; 'দ্যাখা' হল তার ধাতু, তাতেই বিভক্তি জুড়তে হবে। এখন 'দেখাই', 'দেখাচ্ছি', এইসব আউড়ে যাও, দেখবে **'দেখিয়েছি', 'দেখিয়েছ'**-র জায়গায়, **'দেখিয়েছিলাম', 'দেখিয়েছিল'** ইত্যাদিতে আর **'দেখিয়ো', 'দেখিয়ে'**-তে **[এ] হচ্ছে**। অর্থাৎ পরে যেখানে পষ্ট [-ই-] থাকছে সেখানেই 'এ' হচ্ছে ধাতুতে।"

ভন্টু হাততালি দিয়ে বলল, "আবার দড়ি-টানাটানি!"

সামনের সিট দখল

ভন্টু বলল, "কিন্তু কাকু, তুমি যে সেদিন বলেছিলে, 'লেজ' হবে না 'ল্যাজ' হবে—কই সে-কথা তো বলছ না!"

"আরে ওই কথাই তো হচ্ছে!" বলে হিগিনকাকু এবার ভন্টুর বাবাকে বললেন, "এবার তোমার ঝুড়িটা সামনে ধরো, যেটাতে 'অন্যান্য ভদ্রমহোদয়গণ' লেখা। এটাতে কী কী আছে? না বিশেষ্য, বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ ইত্যাদি।"

বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে ক্রিয়ার পাট কি আমরা চুকিয়ে দিলাম?"

"নিশ্চয়ই! আসলে ক্রিয়াপদের 'অ্যা'গুলোকে গুডবাই করছি আমরা, এখন অন্য সব 'অ্যা'-দের ধরছি।"

"বেশ, চালিয়ে যাও!" বাবা সোফায় গা এলিয়ে দিলেন।

হিগিনকাকু বলতে লাগলেন, "লক্ষ করো, সমস্ত বাংলা শব্দে 'অ্যা' শুধু শব্দের গোড়ার সিলেব্‌লেই থাকে, মাঝখানে বা শেষে 'অ্যা' থাকতে পারে না। অন্য সব স্বরধ্বনির সঙ্গে এখানেই 'অ্যা'র তফাত, কিন্তু 'অ'-এর সঙ্গে এখানে মিল।"

"সে কী?" সোফায় আবার খাড়া হয়ে বসলেন বাবা। "তাজ্জব কথা! কাণ্ডটা শোন্‌। কাল ভন্টুকে নিয়ে একটা আবৃত্তির অনুষ্ঠানে গিয়েছিলাম। তুই একদিন বলেছিলি ভালো উচ্চারণ শিখতে হলে আবৃত্তি শোনা ভালো, তাই আজকাল ভন্টুকে নিয়ে যাই দু-একটা আবৃত্তির আসরে। কাল যেখানে গিয়েছিলাম সেখানে আবৃত্তিকার দু-একজন বললেন 'সন্ধ্যা' [শোন্ধ্যা], 'শোন্ধা' নয়, হত্যা [হোত্ত্যা],

'হোত্তা' নয়। তাদের আবৃত্তিতে তো 'অ্যা'টা পরেই আসছে।"

হিগিনকাকু লাফিয়ে নিজের কপালে করাঘাত করে দাঁত কিড়মিড় করে উঠলেন। বললেন, "হায় ঈশ্বর, এরাও সেই উচ্চারণ করছে যাকে বলে 'স্পেলিং প্রোনানসিয়েশান' বা 'বানান দেখে উচ্চারণ'। বাঙালির স্বাভাবিক উচ্চারণ পরের 'অ্যা'-কে 'আ' করে দিতে চায়, আর য-ফলার আগে একটা ব্যঞ্জন থাকলে দুটো বানিয়ে দেয়। 'ব্যাখ্যা'কে তুমি 'ব্যাক্‌খা' উচ্চারণ কর, না 'ব্যাখ্যা'? 'সংখ্যা'কে শোং-'খ্যা' বল, না 'শোংখা'? 'অদ্যাবধি'কে 'ওদ্দাবোধি'-ই তো বল—হ্যাঁ কি না? 'অদ্যাপি'কে 'ওদ্দাপি' বলতো? তবে কেন খামোখা 'হো-ত্ত্যা' 'শো-ন্ধ্যা', 'অমাবো-শ্‌শ্যা' বলবে 'হোত্তা' 'শোন্ধা' 'অমাবোশ্‌শা' না বলে? আগে উপসর্গ থাকলে না-হয় কথা ছিল।"

বাবা বললেন, "আবার কী কথা?"

"সেখানে 'অ-ব্যাহত', 'অ-ন্যায়' এই রকম ভাগ করে 'অ্যা' বলা চলে। তাতেও আজকাল 'আ' এসে 'অ্যা'-দের তাড়াচ্ছে। 'ওব্‌ভাস' (অভ্যাস), উপন্নাস (উপন্যাস), ওদ্‌ধায় (অধ্যায়) শুনছ না?" 'বিজ্ঞ্যান', 'বিজ্ঞান' 'বিখ্যাতো', 'ঠিক্‌খাতো' দুইই শুনি তো।

ভন্টু বলল, "বেশ মজা তো! সামনের সিটে ছাড়া 'অ্যা' দেখি আর কোথাও বসতেই চায় না।"

"হ্যাঁ, অ্যা-র ওই এক ঝামেলা!" বললেন হিগিনকাকু।

ক্ষ্যান্ত-ক্ষেন্তির কথা

"যাই হোক, অনেক ধানাই-পানাই হয়েছে—" কফির তলানিটুকু গলায় ঢেলে দিয়ে চোখ বুঝে ফেললেন হিগিনকাকু, "এখন জেনে নাও ক্রিয়াপদ ছাড়া আর কোন্ কোন্ শব্দের গোড়ায় [অ্যা] স্বরধ্বনিটাকে পাচ্ছি আমরা।"

"বেশ, বলো", বলে বাবা ভন্টু দুজনেই মনোযোগী আর বাধ্য ছাত্রের মতো কান খাড়া করল, ভন্টু খাতা-কলম বাগিয়ে বসল।

"যেমন ধরো, 'এক' হল 'অ্যাক'," হিগিনকাকু শুরু করতেই ভন্টু প্রায় ঝাঁপিয়ে পড়ে বলল, "আহা, সবাই তো 'অ্যাক'-ই বলে, কেউ আবার 'এক' বলে নাকি?"

হিগিনকাকু একটু রেগে গিয়ে বললেন, "ডোন্ট ইনটারাপ্ট মি! বলেই তো! কিন্তু কেউ-কেউ একটু বেশি করে বলে যে।"

বাবা বললেন, "তার মানে? বেশি করে 'অ্যাক' বলে মানে?"

"মানে খুব সরল। ধরো 'একটি' কথাটা। এটা যা লেখা হচ্ছে সেভাবেই উচ্চারণ হচ্ছে—'অ্যাক্টি' নয়, 'একটি'। কিন্তু ক-ত্তো লোক, ধরো তোমার মতো বাঙালেরা, বা মেদিনীপুর বা অন্যান্য উপভাষা-বলিয়ে লোকেরা, দিব্যি বলে যাচ্ছে 'অ্যাক্টি'। ভন্টু-বাবা, লক্ষ্মী ছেলে, গন্ডগোলটা কী হচ্ছে বলতে পারিস?"

ভন্টু গড়গড় করে বলে গেল, "আসলে ওই 'টি'-তে একটি 'ই' আসছে পরে, সেটাই গোড়ার অ্যা-কে টেনে ওপরে তুলে এ বানিয়ে দিচ্ছে, তাই না? সেই

দড়ি-টানাটানির ব্যাপার তো?"

"দারুণ, ভীষণ, সাঙ্ঘাতিক, ঠিক কথা!" বলে হিগিনকাকু তার দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলেন সাতল্লিশ সেকেন্ড। তারপর বললেন, "এই রকম আরও দৃষ্টান্ত লক্ষ করো—পরে 'ই' বা 'উ', মানে [+উর্ধ্ব] স্বরধ্বনি এসে জুড়ছে বলে যা ছিল 'অ্যা', তাই হচ্ছে 'এ'। 'এ'-র জায়গায় 'অ্যা' বললে ফাঁসি! এই দ্যাখো : এক [অ্যাক], কিন্তু একটি, একটু, একীকরণ।

এখন [অ্যাখোন], কিন্তু এখুনি, এক্ষুনি ; এমন [অ্যামোন], কিন্তু এম্‌নি ; কেবলা [ক্যাব্‌লা], কিন্তু কেব্‌লি, ক্ষ্যান্ত, কিন্তু ক্ষেন্তি।"

এইরকম আরও কয়েকটা লক্ষ করো—

ভেড়া	[ভ্যাড়া]	কিন্তু	ভেড়ি
পেঁচা	[প্যাঁচা]	কিন্তু	পেঁচি
নেড়া	[ন্যাড়া]	কিন্তু	নেড়ি
ভ্যাবলা		কিন্তু	ভেবলি
বেটা	[ব্যাটা]	কিন্তু	বেটি

এখন আমরা প্যাঁচা, ব্যাটা, ন্যাড়া এভাবেই য-ফলা আ-কার দিয়ে লিখি।"

এমন সময় দেড় বছরের তিন্নি কী জন্যে যেন চেঁচিয়ে কেঁদে উঠল। ভন্টুর মা রান্নাঘরে ছিলেন, তাই বাবা ছুটে গেলেন তাকে সামলাতে, তাই 'অ্যা'-এর পাঠে তখনকার মতো 'ক্ষ্যান্ত' দিতে হল।

বেথা-ব্যাদ্‌নার খবর

বাবা যখন তিন্নির কান্না থামাতে ব্যস্ত তখন হিগিনকাকু অলক্ষ্যে টেপ-রেকর্ডার চালিয়ে দিয়েছেন। ফলে তিন্নির কান্না একটু ঠান্ডা হয়ে এসেছে, অমনি টেপ-রেকর্ডার থেকে তার আকুল কান্না আবার বেজে উঠল, আর তিন্নি কান্নাটান্না সব ভুলে গিয়ে গোল-গোল চোখে তাকিয়ে রইল। বাবা তখন তাকে কোলে তুলে নিয়ে বললেন, "পড়াটা চলুক না আবার।"

হিগিনকাকু চোখমুখের নানা ভঙ্গি, গলার বিচিত্র আওয়াজ করে তিন্নিকে খুশির মেজাজে ফিরিয়ে আনলেন, তারপর সে ছুটে-আসা মার হাতে দুধের বোতল দেখে এক গাল হাসল। হিগিনকাকু বলতে লাগলেন, "বার বার করে যেটা বলতে চাইছি, তা হল, এই যে 'এক' [অ্যাক] একটি-তে 'এক' [এক] হচ্ছে, 'এই পরিবর্তনটা নিয়মে বাঁধা সেই জিভের কুঁড়েমির জন্যে। তা আমাদের স্যারের 'ভ্যাক' আর 'বেঙ'-এর মতো ঠিক জায়গা-বদলের ব্যাপার নয়।"

বাবা হঠাৎ খাড়া হয়ে বসে মুখে একটু হাসি এনে বললেন, "আমারও মনে

পড়ছে রে এ রকম একটা গল্প। বলব?"

হিগিনকাকু বললেন, "গল্প না হলে ভাষাবিজ্ঞান হজম হয় নাকি? একশোবার বলবে!"

"দেশ ভাগের পর এখানে এসে যে স্কুলে ভর্তি হয়েছিলাম সেটা উদ্বাস্তুদেরই স্কুল, তার মাস্টারমশাইরাও সকলেই ওপারের। সেবার পুজোর ছুটির আগে মাস্টারমশাইরা থিয়েটার করবেন। বই ধরেছেন শরৎচন্দ্রের 'ষোড়শী'। আমরা দু-একটি নেতৃস্থানীয় ছেলে সেদিন রিহার্সাল দেখার অনুমতি পেয়েছি। ষোড়শীকে এক জায়গায় জীবানন্দ, মানে জমিদারমশাই, বলছে 'ষোড়শী, বড়ো ব্যথা।' তা আমাদের প্রভাতবাবু-স্যার, ময়মনসিংহ-এ এঁরা সত্যি জমিদার ছিলেন, প্রতিবারই বলছেন, 'বর বেথা।' পরিচালক হিতেনবাবু তো পাগল হয়ে গেলেন ওই 'বেথা' নিয়ে। শেষে বললেন, আচ্ছা প্রভাতবাবু, আপনি ড় বলতে পারবেন না বুঝলাম, ওটা ছেড়ে দিন। কিন্তু ব্যথা না বলে বেদনা বলুন। প্রভাতবাবু তখন কী বললেন জানিস?"

"জানি," হিগিনকাকু কষ্টের অভিনয় করে মুখচোখ কুঁচকে বললেন, "ষুরশী, বর ব্যাদ্‌না।"

বাবা হেসে উঠলেন, "রাইট!"

হিগিনকাকু বললেন, "কিন্তু 'অ্যা' আর 'এ'-র এই অদল-বদল নয়। আমরা এখন যা নিয়ে পড়েছি, তাতে 'অ্যা' যখন পাশে 'ই' বা 'উ'কে দেখছে না তখন নিজের জায়গায় গ্যাঁট হয়ে বসে আছে। কিন্তু বিভক্তি বা প্রত্যয়ের সঙ্গে 'ই' বা 'উ' এলেই লাফিয়ে 'এ' হয়ে যাচ্ছে।" বলেই পেটের দিকে আঙুল দেখিয়ে বললেন, "কিন্তু খুব খিদে।" তারপরেই বললেন, কিন্তু এই 'এক' নিয়ে একটা কথা বলতে ভুলে গেছি। ঠিক পরের সিলেব্‌লে 'ই' বা 'উ' থাকলে 'অ্যাক' হবে 'এক'। কিন্তু দ্যাখো, আজকাল সবাই বলছে এ দিয়ে এক্‌চোল্লিশ, এক্‌শোট্টি, একাশি, একানব্বই, **এগুলো সব কিন্তু অ্যাক্‌চল্লিশ, অ্যাকান্নো, অ্যাকশোট্টি, অ্যাকাত্তর, অ্যাকাশি, অ্যাকানব্বোই হবে**। এখানে 'অ্যাক্'-এর এক হওয়ার কোনো কারণ নেই। ই-টা পরে নেই, আছে অন্য কিছু। এমনকি **অ্যাকোত্রিশ**। তবে 'এক্‌ত্রিশ' হবে, কারণ এখানে মাঝখানে কিছু নেই, 'একুশ' তো হবেই।

'এক' নিয়ে ঝামেলা

বেশ উপাদেয় সব পদ দিয়ে দুপুরের খাওয়াদাওয়া সেরে হিগিনকাকু ভুঁড়িতে হাত বুলোতে বুলোতে ঢুলুঢুলু চোখে বললেন, "'এক' নিয়ে প্রচণ্ড ঝামেলা। মনে রাখবে এক, **একচল্লিশ, একষট্টি, একাত্তর, একাশি, একানব্বই—সবগুলোতেই 'অ্যা' হবে,** কারণ পরের সিলেব্‌লে [ই] বা [উ] নেই। অ্যাকচল্লিশ অ্যাকষট্টি কক্ষনো [একচোল্লিশ] [একশোট্টি] হবে না। কিন্তু একুশ এক্‌ত্রিশ [এ] দিয়ে, [অ্যা] দিয়ে নয়। কেউ কেউ ওবিশ্যি 'অ্যাকোত্রিশ'ও বলে। সেখানে [অ্যা] মেনে নেওয়া চলে। তেমনি, আবার বলছি, একটি একটু—অ্যাক্‌টি, অ্যাকটু নয়।

বাবা বললেন, "আমি গণ্ডগোলে পড়ি এইসব কথা নিয়ে : অ্যাকতা, না একতা? অ্যাকত্র, না একত্র? অ্যাকদা, না একদা? অ্যাকাকী, না একাকী? অ্যাকাদশ, না একাদশ? অ্যাকান্ত, না একান্ত? কোন্‌টা ঠিক হবে বুঝতে না পেরে মাথাটা কেমন গুলিয়ে যায় রে। এর নিয়ম কী? এর কোন্‌টা ঠিক?"

হিগিনকাকু বললেন, "'একতা' কথাটাকে আপাতত আলমারিতে যত্ন করে গুঁজে রাখতে পারো, ওটা বেশিরভাগ সময় 'একতা'ই হয়, 'অ্যাকতা' নয়। কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে, ক'দিন্ পরে 'অ্যাকতা'ও চালু হয়ে যাবে—তখন কেউ বলতে পারবে না ওটা বাঙালদের উচ্চারণ, স্ট্যান্ডার্ড নয়। আসলে এই কথাগুলো নিয়ে মুশকিল কী জানো? মুখের কথায় বাকিগুলো 'অ্যাকত্র, অ্যাকদা, অ্যাকাকি, অ্যাকাদশ, অ্যাকান্ত' ঠিক আছে—ওই হল স্ট্যান্ডার্ড। কিন্তু যেই তুমি সংস্কৃত শব্দ-ভর্তি সাধু ভাষার গদ্যে ওগুলো পড়বে, কিংবা সংস্কৃত লেখার মধ্যে পাবে ওগুলোকে—তখনই 'এ' দিয়ে উচ্চারণ করতে হবে। যদি গানেও পাও—তাহলেও 'এ' দিয়েই তার উচ্চারণ হবে। গানের ভাষা একটু পুরোনো তো? এইজন্য রবীন্দ্রসংগীতে এ সবেরই উচ্চারণ 'এ' দিয়ে। রবীন্দ্রনাথ তো 'তেমনই'-কেও 'তেমোনই' উচ্চারণ দিয়েছেন, মুখের কথার 'ত্যামোনই'-কে গানে তিনি পাত্তাই দেন না। অর্থাৎ তোমার কথার ভঙ্গি বা স্টাইল অনুযায়ী ঠিক হবে 'অ্যা' না 'এ' হবে। 'একাঙ্ক' মুখের কথায় কম বলি বলেই 'অ্যা' তাতে কম বলি। বুঝেছ?"

এতক্ষণ ভন্টু ছিল নীরব শ্রোতা। তাতে তার একটু অপমান বোধ হচ্ছিল। এবার সে নেহাৎ প্রশ্ন করার ঝোঁকেই বলে বসল, "এরকম আর কিছু আছে? দুটো স্টাইলে যার দুরকম উচ্চারণ?"

হিগিনকাকু তার মাথার চুল এলোমেলো করে দিয়ে আদরের সুরে বলেন, "আছে বই-কী, বাঁধাকপি আমার! 'মেনকা' আর 'পেখম'। মুখের কথায় ম্যানোকা, প্যাখোম, কিন্তু সংস্কৃতবহুল গদ্যে আর গানে মেনকা, পেখম।" তারপর হাত তুলে ভন্টুকে নিরস্ত করে বললেন, "ফরাসিরা বাচ্চাদের আদর করে ডাকে 'মঁ শু', তারই বাংলা 'বাঁধাকপি আমার'। রাগ করিস নে বাপ্।"

আরও এক দঙ্গল

"কিন্তু 'একলব্য' কী হবে?" বাবা হঠাৎ বুড়ো আঙুল তুলে জিজ্ঞেস করলেন, যেন একলব্যের ভয়ংকর গুরুদক্ষিণার কথা মনে পড়ে গেল তাঁর—"'একোলব্বো' না 'অ্যাকোলোব্বো'?"

"আঁই শাবাশ, বড়দা, ঠিক মনে করিয়ে দিয়েছ। ওটা 'একোলব্বো'ই স্ট্যান্ডার্ড। 'এক' 'অ্যাকো' হয়নি আর 'লব্য' স্বরসংগতির নিয়মে 'লোব্বো' হয়নি।"

"কেন হয়নি?" ভন্টু জিজ্ঞেস করল।

হিগিনকাকু বললেন, "মনে রাখবে, যে-শব্দগুলো আমরা বেশি ব্যবহার করি সেই শব্দগুলোরই ধ্বনি আগে বদলায়। যেগুলো মুখে কম বলি সেগুলো তত তাড়াতাড়ি চেহারা বদলায় না। 'একলব্য' ওই রকম একটা কম-চালু শব্দ। যে-মানুষটা আমার বেশি চেনা, তাকে ঘাঁটাতে পারি, তার পেছনে লাগতে পারি, তাকে নিজের ইচ্ছেমতো খানিকটা চালিয়েও নিতে পারি। কিন্তু যার সঙ্গে আলাপ বেশি নেই, তাঁকে ঘাঁটাতে সাহসই হয় না প্রথমে। শব্দের বেলাতেও তাই। এইজন্যে দেখবে হয়তো একটা নিয়মের জালে বেশ কিছু শব্দ ধরা পড়েছে, আবার কিছু শব্দ দিব্যি বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে।"

ভন্টু বলল, "কাকু, এ-রকম হাওয়ায় হাওয়ায় কথা না বলে দুটো-একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দাও-না ছাই!"

হিগিনকাকু হেসে বললেন, "ঠিক আছে বাবা দিচ্ছি। ধরো 'গদ্য' উচ্চারণ করি 'গোদ্দো'। ঠিক আছে, পরের অক্ষরে য-ফলা আগের সিলেব্‌লের অ-কে ও বানাচ্ছে। বহুবার বলেছি সে সব কথা। কিন্তু এরই পাশে দ্যাখো 'মদ্য' বলছি 'মদ্দো' ; 'মোদ্দো' বলছি না। 'সদ্যোজাত' বলছি শদ্দোজাতো, শোদ্দোজাতো বলছি না। তার কারণ আর কিছুই না, 'গদ্য' 'পদ্য'-এর তুলনায় 'মদ্য' 'সদ্য' আমরা কম ব্যবহার করি। 'তথ্য'-ও তাই। ক্ষ-ওলা 'দক্ষ'-তেও দ-এ অ থেকে যায় প্রায়ই।"

বাবা বললেন, "হচ্ছিল তো অ্যা-র কথা।"

হিগিনকাকু বললেন, "অ্যার-কথা আর কত বলব। এবার একটা লিস্টি দিয়ে দিই শব্দের। গোড়ায় 'এ' থাক, এ-কার থাক—সবগুলোই উচ্চারণে 'অ্যা' হবে। সবগুলো দিচ্ছি না—যেগুলো নিয়ে গোলমাল বেশি সেগুলোই দিচ্ছি। নে ভন্টু, লেখ্ বাবা—" বলে হিগিনকাকু রাজধানী এক্সপ্রেসের গতিতে বলে গেলেন, "**এলাচ**, কেরামতি, খেলনা, **খেসারত**, গেঁড়াকল, চেলাকাঠ, জেঠা, ঠেঙা, ঢেঁড়া, **ঢেলা**, তেলাপোকা, দেওর, নেওটা, নেড়া, **পেখম**, পেঁটরা, ফেনা, বেগার, **বেচারা**, **বেচারি**, বেড়া, বেলা (সন্ধে **বেলা**' কিন্তু 'সমুদ্র'-বেলা এ দিয়ে) **বেসন**, ভেজাল, ভেলা, **মেনকা**, **মেরামত**, **লেজ**, শেওড়া, শেওলা, হেনস্তা, হেলা (অবহেলা)।"

"কালো কফি দাও! শিগ্‌গির!" বাবা আর্তনাদ করে ডাকলেন।

যেতে যেতে চায় না যেতে
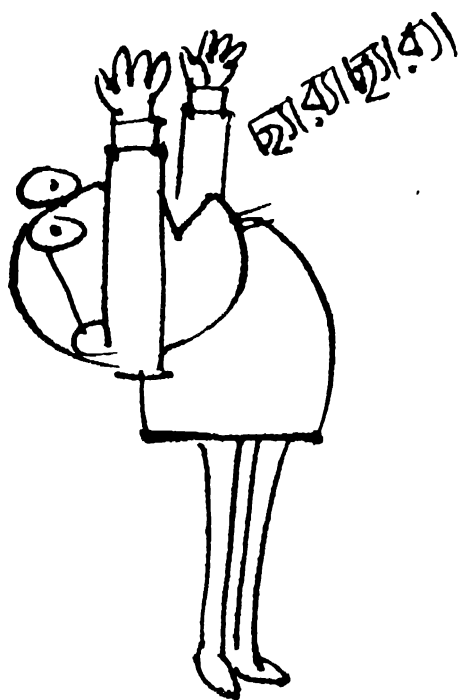
ভন্টু এবার অস্থির হয়ে বলল, "কাকু, 'অ' নিয়ে তুমি যেমন বড্ড ফেনিয়েছ, 'অ্যা' নিয়েও তাই করবে না কি। এ দেখছি কিছুতেই আর শেষ হতে চায় না।"

হিগিনকাকু হঠাৎ চেঁচিয়ে বললেন, "ব্যাটার ছ্যা-র‍্যা-র‍্যা-র‍্যা, চলেছে যেন রেকারিং ডেসিমেল",—বলে হ্যা-হ্যা-হ্যা করে হাসতে লাগলেন। বাবাও অভিযোগের সুরে বললেন, "হ্যাঁ রে, 'অ' আর 'ও', 'অ্যা' আর 'এ' নিয়েই যদি এত সময় কাটাবি তাহলে অন্য স্বরধ্বনিগুলো ধরবি কখন? তুইই তো বলেছিস স্ট্যান্ডার্ড বাংলায় মোট সাতটা আছে স্বরধ্বনি। বাকি পাঁচটার কী গতি হবে?"

"এলিমেনটারি, মাই ডিয়ার ওয়াটসন!" বলে হিগিনকাকু হঠাৎ শার্লক হোমসের ভূমিকায় চলে গেলেন। বললেন, "বড়দা, উত্তর খুব সহজ। বাকি পাঁচটা স্বরধ্বনি নিয়ে উচ্চারণে কোনো গণ্ডগোল নেই। 'অ' আর 'অ্যা' নিয়েই যত শুকনো ঝামেলা। 'অ' কথায়-কথায় 'ও' হয়ে যাচ্ছে, আর 'অ্যা' হচ্ছে 'এ'। বানান

থেকে সেটা বোঝা যায় না, তাই স্ট্যান্ডার্ড ভাষায় নিয়ম যারা জানে না তারা অ-র জায়গায় 'ও' বলে, ও-র জায়গায় 'অ'। অ্যা-র জায়গায় 'এ' বলে, এ-র জায়গায় 'অ্যা'। এই দুটো স্বরকে যে কবজা করতে পারে তার আর মার নেই।"

"তা 'অ্যা'-র আর কদ্দূর বাকি?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

"বেশি না, আর দু-একটা কথা। 'একক' কথাটা 'এ' দিয়েই হবে—এটা তখন বলতে ভুলে গেছি। 'অ্যাকক' কক্ষনো নয়। য-ফলাওয়ালা 'ব্যক্তি' এবং 'ব্যতিক্রম' [বেক্তি] [বেতিক্রম] উচ্চারিত হবে, এ-ধ্বনি দিয়ে, সেভাবে ব্যথিত [বেথিত] হতে পারে। কিন্তু ব্যয়িত-তে 'অ্যা'-ই হচ্ছে—তার কারণ—"

ভন্টু হিগিনকাকুর কথা কেড়ে নিয়ে বলল, "কারণ এগুলো কম চালু"।

"সোনার চাঁদ ফুলকপি আমার!" বলেই হিগিনকাকু বললেন, "এটা কিন্তু ফরাসিদের কথা নয়, আমার বানানো। আমি বাঁধাকপির চাইতে ফুলকপি বেশি ভালোবাসি কি না!"

ভন্টু বলে উঠল, "আজ কিন্তু ফুলকপির রোস্ট বানিয়েছে মা!"

হিগিনকাকু বললেন, "সে কি আমি টের পাইনি ভেবেছিস? আজ ডান হাতের ব্যবহারটা তুই শুধু দেখে যাবি খাবার টেবিলে। কোনো কথা বলবি না।" বলেই হঠাৎ গলা চড়িয়ে বললেন, "হ্যাঁ, খেয়াল রাখিস, উচ্চারণ কিন্তু [ব্যাবোহার], [ব্বোহার] নয়। [ব্যাবোস্থা], [ব্বোস্থা] নয়। [ব্যায়] হবে 'ব্যয়'-এর উচ্চারণ, [ব্বয়] কক্ষনো নয়, যদিও অব্যয়-এর উচ্চারণ [অব্বয়]। দ্ব্যর্থক 'দর্থোক্' নয় 'দ্যার্থোক্'।

বাবা বললেন, "স্কুলে সংস্কৃতের পণ্ডিতমশাই ও-রকম বলতেন। আমরা ভাবতাম সংস্কৃতমতে ওইসবই শুদ্ধ বুঝি। পরে জেনেছি সংস্কৃতেও ও-রকম উচ্চারণ নয়।"

"দাদা রে", হিগিনকাকু বললেন, "ভাষাটা হল বাংলা। তার নিয়ম আলাদা।" বলেই চেঁচিয়ে রান্নাঘরের দিকে হাঁক ছাড়লেন, "ফুলকপির রোস্ট, তুমি আর কত দূরে?"

অশ্রুজলে অ্যা-র বিদায়

পেট ভরে ফুলকপির রোস্ট খেয়ে খুশির উদ্‌গার তুলে সোফায় এসে বসলেন হিগিনকাকু, হাতে কালো কফির কাপ।

বাবা আর ভন্টু বসলেন উলটোদিকে। হিগিনকাকু বললেন, "এবার অশ্রুজলে অ্যা-কে বিদায় জানানো যাক। 'অ' আর 'অ্যা' এই দুজনেই অনেকদিন আমাদের সঙ্গো ছিল। বাংলা স্বরধ্বনির এই দুটি ফচকে ফিচেল বালককে নিয়েই ঝামেলা। 'অ' যে কখন ফাঁক পেলেই 'ও' হয়ে যাচ্ছে আর 'অ্যা' কখন কী সুবাদে 'এ' হয়ে যাচ্ছে—সেটা যে ধরতে পারবে না সে স্ট্যান্ডার্ড বাংলাটাও জানে না বলে ধরে নিতে হবে। 'অ'-এর সূত্রগুলো তোমাদের দিয়েছি, 'অ্যা'-এর বিষয়ে দু-একটি সূত্রও বলেছি তোমাদের। এখন 'অ্যা' বিষয়ে কতকগুলো কাজের কথা বলব, ভন্টুবাবা, খাতায় নিকে রাকো।"

ভন্টু অনিচ্ছাসত্ত্বেও খাতাটা খুলল, কলম বাগিয়ে ধরল। হিগিনকাকু বললেন, "প্রথমত, শব্দের মাঝখানে 'অ্যা' ঠিক আসে না। অবশ্য উপসর্গ থাকলে মনে হয় যে, অনেক শব্দে 'অ্যা' তো ওই মাঝখানেই আছে। যেমন অন্যায়, অধ্যায়,

অব্যাহত, অখ্যাত। উপসর্গ তুলে নাও, দেখবে ওসব 'অ্যা' আসলে শব্দের গোড়াতেই। এই হল গিয়ে এক।"

ভন্টুর 'গুপি গায়েন বাঘা বায়েন'-এর গান থেকে "এক নম্বর, এক নম্বর" গেয়ে ওঠার ইচ্ছে হচ্ছিল। কিন্তু গাঁট্টা খাবার ভয়ে চুপচাপ রইল।

"দুই, গোড়ায় না থাকলে য-ফলা আকারের (্যা) উচ্চারণে 'আ'-ই স্বাভাবিক। হত্যা হবে [হোত্তা], সন্ধ্যা হবে [শোন্ধা,] সমস্যা হবে [শমোশ্শা], অগত্যা হবে [অগোত্তা]। কিছুতেই [হোত্ত্যা], [শোন্ধ্যা], [শমোশ্শ্যা], [অগোত্ত্যা] নয়। তবে [বিজ্জ্যান] [বিজ্জান], [অজ্জাত] [অজ্জ্যাত], দুই-ই আপাতত চলবে। আমার ধারণা, পরে এসব জায়গায় 'আ' 'অ্যা'-কে ঘাড়ধাক্কা দিয়ে বার করে দেবে।

"তিন নম্বর, যুক্তব্যঞ্জনে এ-কার সবসময় 'এ', কখনোই 'অ্যা' নয়! যেমন স্নেহ, প্রেম, ক্রেতা, দ্বেষ, প্রেরণা।"

"চার, কিছু তৎসম শব্দে প্রথম অক্ষরে এ-কার এবং পরের অক্ষরে স্বরান্ত 'য়' থাকলে, ওই এ-কার 'অ্যা' হবে না—যেমন দেয়, পেয়, হেয়, গেয়।

"পাঁচ, দ্বিতীয় সিলেব্‌লে (উচ্চারণ করে দ্যাখো) 'ই' বা 'উ' ধ্বনি থাকলে গোড়ার এ-কার 'এ' হিসেবেই উচ্চারিত হবে। যেমন পেঁচি, নেকু, বেটি, হেংলু। ব্যস, এবার অ্যা-এর বিদায়-সংগীত গাইছি—"বলে হিগিনকাকু হেঁড়ে গলায় গান ধরলেন,

"বুড়োটা ছিল ভাল-ও-ও।
চাষ করিত বোম্বাই মুলো-ও-ও,
রাতের বেলা ধুনতো তুলো-ও-ও, বুড়োটা ছিল ভাল-ও-ও।"

তারপর সোফায় দেহ এলিয়ে দিয়ে নাকের ভাষাতত্ত্বের আলাপ-আলোচনা করতে লাগলেন।

সবাই বদলায়, কিন্তু
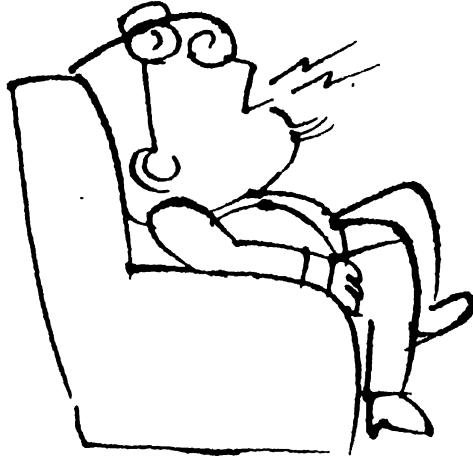
ভন্টুর মনের মধ্যে দু-একটা প্রশ্ন উঁকিঝুঁকি দিচ্ছিল। কিন্তু হিগিনকাকু সোফায় দিব্যি নাক ডাকিয়ে ঘুমোচ্ছেন, ভন্টু নিজেই দুটো বালিশ এনে তাঁর মাথার নিচে গুঁজে দিয়েছে স্বচ্ছন্দ ঘুমের জন্যে, ফলে উসখুস প্রশ্ন নিয়েই ভন্টুকে অপেক্ষা করতে হল। চারটে নাগাদ হিগিনকাকু আধখানা চোখ খুলে বললেন, "কালো কফি", তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়লেন। মিনিট কয়েকের মধ্যে টেবিলে কালো কফি এসে পৌঁছোল। তার ধোঁয়া নাকে পৌঁছোতেই জাদুমন্ত্রের মতো নাকের ডাক থেমে গেল যেন। হিগিনকাকু উঠে বসে আড়মোড়া ভাঙলেন, কফির কাপ তুলে নিয়ে 'সুড়ুত সুড়ুত' চুমুক দিলেন, যথারীতি, 'আ—হ্' করে উঠলেন। তারপর প্রসন্ন মুখে বললেন, "বলো বৎস, কী বৃত্তান্ত!"

বাবা কী একটা কাজে বেরিয়েছেন। একা-একা ভন্টু একটু ঘাবড়ে গেল। কী জানি যদি খুব বোকার মতো প্রশ্ন করে ফ্যালে! তারপর ভয় ঝেড়ে বলেই ফেলল, "আচ্ছা কাকু, 'অ' আর 'অ্যা' নিয়েই তো তুমি অ্যাদ্দিন কাটালে। তা মুখের বাংলা ভাষায় আরও তো স্বরধ্বনি আছে, তাই না?"

হিগিনকাকু বললেন, "হুঁ, আরও পাঁচটা—'আ', 'এ', 'ও', 'ই', 'উ'—বলে যাও। তাছাড়া আছে 'নাকি স্বর' অর্থাৎ অনুনাসিক স্বরধ্বনি। সেগুলো ওই একই স্বরধ্বনি, শুধু নাকি আওয়াজটা বাড়তি। বলে যাও কী বলিতেছিলে—"

"না, মানে 'অ' 'ও' হচ্ছে, আর 'অ্যা' 'এ' হচ্ছে সে তো তুমি তন্নতন্ন করে বুঝিয়ে দিলে ; কিন্তু আরগুলো বদলায় না? ওঠানামা করে না?"

হিগিনকাকু "ওয়াহ্ গুরুজিকি ফতে!" বলে প্রায় চিৎকার করে উঠলেন, বললেন, "রাজার মতো প্রশ্ন করেছিস বাপ! বাকিগুলো বদলায় বই-কী। কিন্তু ওই বদলগুলোকে আমরা পাত্তা দেব না।"

"তার মানে?" ভন্টু একটু ধাঁধায় পড়ল।

"মানে খুব সোজা। আশে-পাশে 'ই' বা 'উ' থাকলে 'ই'-'উ' নিজেরা ছাড়া আর সবাই বদলেছে। পরের 'ই' বা 'উ' [এ]-কে করেছে [ই] : যেমন দেশি > দিশি, শেখ্+ই > শিখি, কেন্+উক > কিনুক। একইভাবে [ও] হয়েছে [উ] : যেমন রোগী > রুগি, ভোজ্য > ভুজ্যি (মাঝখানে 'ভোইজ্জ', 'ভুইজ্জ' হয়েছিল)। আগে 'ই' বা 'উ' থাকলে [আ] হয় যথাক্রমে [এ] এবং [ও] : যেমন ফিতা > ফিতে ; জুতা > জুতো। আবার কদাচিৎ পরে 'আ' বা 'অ' থাকলে [ই] হয়েছে [এ] আর [উ] হয়েছে [ও] : যেমন শিয়াল > শেয়াল, উপর > ওপর। এগুলো নিয়ে আমরা মাথা ঘামাব না। কারণ, বানান থেকে তাদের উচ্চারণ করতে তেমন অসুবিধে নেই।"

ভন্টু বলল, "উচ্চারণ যেখানে বানান থেকে ঠিক ধরতে পারছি না শুধু সেইগুলো নিয়েই—"

হিগিনকাকু তাকে কথা শেষ করতে না দিয়ে অবাঙালি উচ্চারণে বললেন, "কার্‌র্—রেক্‌ট! এবার চলো ভূতেদের পাড়ায়!"

ভূতেদের চন্দ্রবিন্দু-প্রীতি

হিগিনকাকু একটু হেসে বললেন, "'ভূতেদের পাড়ায় যাব' মানে বুঝিসনি? দ্যাখো কাণ্ড! বোস্ বোস্। আসলে আমরা 'নাকি স্বর' অর্থাৎ অনুনাসিক স্বরধ্বনি নিয়ে কথা বলব এখন!"

ও হরি! এই নাকি ভূতেদের পাড়ায় যাওয়া! ভন্টু দমে গিয়ে বসে পড়ল। কিন্তু হিগিনকাকু একটা ভূতের গল্প বলতে শুরু করে ওর দুঃখ ভুলিয়ে দিলেন খানিকটা। তারপর হাত-পা নেড়ে যেই বলেছেন "ওঁরে যাঁসনি, যাঁসনি। আঁমাকে কঁটা মাছ দিঁয়ে যাঁ—নইলেঁ তোঁর ঘাঁড় মটকেঁ রঁক্ত খাঁবঁ—" তখন ভন্টু তো প্রায় শিউরে লাফিয়ে ওঠে। এইখানেই হঠাৎ গল্প বন্ধ করলেন হিগিনকাকু। বললেন, "ধরো তুমি ভূত নও।" তারপর নিজেই হেসে ফেললেন—"দুত্তোর, ধরবি আবার কী, তুই ভূত তো নোসই। কীভাবে ভূতের ওই কথাটা তুই বলবি দ্যাখা তো!"

ভন্টু "ওরে যাসনি যাসনি" করে স্বাভাবিক মানুষের গলায় কথাটা বলে গেল। তারপর বুদ্ধিমানের মতো বলল, "ভূতের কথায় শুধু চন্দ্রবিন্দু আর চন্দ্রবিন্দু।"

হিগিনকাকু বললেন, "শুধু ভূতেদের কথায় কেন হবে? আমাদেরও অনেক শব্দ আছে যাতে আমরা চন্দ্রবিন্দু ব্যবহার করি। অর্থাৎ সেগুলোতে একটা স্বরধ্বনি বা ভাওয়েল আছে যাকে বাংলায় বলে অনুনাসিক। ইংরেজিতে নেজাল (nasal)। সোজা কথায় সেটা 'নাকি' স্বর। যেমন আঁচল, চাঁদ, পাঁচ (সব কটাতেই অনুনাসিক

আ) ; ইঁট, পিঁড়ি (অনুনাসিক ই) : গুঁতো, হুঁশ (অনুনাসিক উ) ইত্যাদি।"

ভন্টু দুহাতে নাকের ফুটো টিপে ধরে কথাগুলো বলবার চেষ্টা করছিল। হিগিনকাকু বারণ করলেন, "আরে নাক টিপে নয়, নস্যি দিয়ে নাকের ফুটো বন্ধ করেও নয়, নাক খুলেই অনুনাসিক স্বর উচ্চারণ করতে হয়। এখানেই হল তফাত। মুখের স্বর বা ওরাল ভাওয়েল উচ্চারণে বাতাসটা বেরুবে শুধু মুখ দিয়ে; আর নাকের স্বর উচ্চারণে মুখ আর নাক দুটো রাস্তা দিয়েই বাতাস বেরুবে। শোন, আলজিভের পেছনদিকে নাকের ফুটোর রাস্তা। নাকের স্বর উচ্চারণ করবে তো? ঠিক হ্যায়, আলজিভটা হালকা করে নামিয়ে দাও ; ব্যস, নাকের ফুটোর রাস্তা খুলে গেল। এবার উচ্চারণ করে অঁ, আঁ, ইঁ, উঁ, অ্যাঁ, এঁ, ওঁ।"

ভন্টু বলল, "আমি কেন উচ্চারণ করতে যাব? আমি তো পারিই। আমার ও আলজিভ নামানোর দরকার নেই।"

হিগিনকাকু বললেন, "কিন্তু আমরা বাঙালরা পারি না জানিস তো? বলি 'আসল' (আঁচল), 'সাদ' (চাঁদ), 'পাস' (পাঁচ), 'পিরি' (পিঁড়ি)। আমাদেরই ঝামেলা।"

"তা তোমরা কী করবে এখন?"

"আমরা?" হিগিনকাকু ঘুষি তুলে বললেন, "আমরা নীচের জোড়া-জোড়া কথাগুলো তোর কাছে শুনে প্র্যাকটিস করব—বাস-বাঁশ, আঁক-আখ, খাটি-খাঁটি, বাধা-বাঁধা, চাদর-চাঁদের, পাঠা-পাঁঠা, কাটা-কাঁটা। তুই আমাদের শিখিয়ে দিবি, কেমন?"

ঠাকুরদাদার ওভারকোট

ভন্টুর বাবা ফিরে এলেন সন্ধে নাগাদ। ভন্টুকে সেদিনের ভাষাবিজ্ঞানের পড়া কী হল জিজ্ঞেস করায় ভন্টু বলল, "স্বরধ্বনির গঙ্গাযাত্রা" হয়েছে। বাবা বুঝতে না পেরে হিগিনকাকু মুখের দিকে তাকালেন, হিগিনকাকু মিটিমিটি হেসে বললেন, "ভন্টু একদম বিলকুল ঠিক বাত বলেছে। আমরা চন্দ্রবিন্দুওয়ালা স্বরধ্বনি নিয়ে আলোচনা করেছি।"

"আর এখানেই তো স্বরধ্বনির শেষ, তাই না কাকু?"

"হ্যাঁ, যার গঙ্গাযাত্রা হয়ে গেল তাকে নিয়ে আর টানাটানি কেন? তবে এর মধ্যে একটা কিন্তু আছে।"

"সে আবার কী?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

হিগিনকাকু উত্তর দিলেন, "এই ধরো, এখন আমরা 'ঋ'-ফলার উচ্চারণ নিয়ে আলোচনা করব। সংস্কৃতের বর্ণমালায় ঋ স্বরবর্ণের মধ্যে গছানো রয়েছে। কিন্তু বাংলায় ঋ-এর উচ্চারণ পরিষ্কার 'রি', অর্থাৎ র্+ই। ব্যঞ্জনধ্বনি+স্বরধ্বনি মিলিয়ে একটা সিলেব্ল বা 'দল'। সুতরাং 'ঋ' বাংলায় 'স্বরবর্ণ' হলেও 'স্বরধ্বনি' নয় অর্থাৎ বর্ণমালায় তা স্বরবর্ণের তালিকায় আছে কিন্তু উচ্চারণে তা কখনোই স্বরধ্বনি নয়। সংস্কৃত 'ঋ' বাংলায় উচ্চারিত হয় 'রি', অন্যদিকে মারাঠি গুজরাটি

তামিল ওড়িয়াতে হয় 'রু'। যেমন 'অম্রুতাঞ্জন'।"

বাবা বললেন, "হ্যাঁ, সেদিন সংযুক্ত পাণিগ্রাহীর ওড়িশি নাচ দেখতে গিয়েছিলাম। সেখানে দশাবতার স্তোত্রের গান শুনলাম—'কেশবধৃত মীনশরীর'—তা গাওয়া হল 'কেশবধ্রুত মীনশরীর।"

"ঠিক বলেছ। ঋ এখন আর কোনো স্বরধ্বনি নয় বাংলায়।"

"তাহলে সে আমাদের বর্ণমালায় বসে আছে কেন?" ভন্টু জিজ্ঞেস করল।

"সেইটাই তো মজা। এ বর্ণমালাটাও আমাদের নয়। এ হল সংস্কৃতের বর্ণমালা। আমরা প্রায় হুবহু তার ছাঁচটা ব্যবহার করে চলেছি। এ হল ঠাকুরদাদার ওভারকোটের মতো। ঠাকুরদাদা স্বর্গে গেছেন, ট্রাঙ্কে তুলে রাখা তাঁর ওভারকোট বার করে নাতি ব্যবহার করছে। কিন্তু গায়ে ঠিক ফিট করে না। কোথাও একটু ঢিলে, কোথাও একটু চাপা। আমাদের বর্ণমালাও তেমনি।"

"কী রকম?"

"ধরো বর্ণমালায় স্বরবর্ণ হল অ থেকে ঔ। কিন্তু, ঈ, ঊ, ঋ আমাদের উচ্চারণে নেই বললেই হয়। সেগুলো বাড়তি বর্ণ। ওভারকোটটা এখানে ঢিলে। আবার আমাদের মুখের 'অ্যা' ধ্বনিটার জন্যে কোনো 'বর্ণ' নেই—এখানে ওভারকোট একটু চাপা। ঐ ঔ হল আরেক কাণ্ড।"

"সে আবার কী?" বাবার প্রশ্ন।

"কথা হল, ঐ আর ঔ একটা একটা স্বরধ্বনি নয়, দুটো করে স্বরধ্বনির যোগফল। এদের বলে যৌগিক স্বর বা ইংরেজিতে ডিফ্‌থং। সংস্কৃতে এই দুটোই ছিল যৌগিক স্বর। বাংলায় আছে প্রায় দেড় ডজন। বর্ণমালায় দুটোর জায়গা হল, বাকিগুলোর খোঁজ কে নেবে?"

"ঠাকুরদাদার ওভারকোট নিয়ে ঝামেলা তো কম নয়।" ভন্টু বলে উঠল।

ঋ-কার হইতে সাবধান

"সে যাকগে। বর্ণমালা যা আছে তা আছেই। যতক্ষণ না তোমরা তা বদলে ফেলছ ততক্ষণ আমাদের কিছু করবার নেই"—হিগিনকাকু দাঁড়ি টেনে বললেন, "এই হল গিয়ে কতা।" তারপরেই বোকা-বোকা হেসে জিজ্ঞেস করলেন, "কিন্তু আসল কতাটা যেন কী ছিল রে খুল্লতাত?"

ভন্টু হেসে বলল, "তুমি ঋ-এর উচ্চারণ নিয়ে আরম্ভ করেছিলে?" "এক্কেবারে এয়ার কন্ডিশন্‌ড ক্লাস—মানে ফার্স্ট ক্লাসের চাইতেও ভালো। আচ্ছা, ঋ তাহলে কী হল বাংলায়?"

ভন্টু বলল, "কেন? পরিষ্কার র-এ হ্রস্ব-ই 'রি'। সংস্কৃতে এটাকে স্বরবর্ণ বলত কেন কে জানে?"

"আমি জানি বাপু", হিগিনকাকু বলে উঠলেন, "যদি বলি স্বরবর্ণের মতোই ওই ঋ সিলেব্‌লের কেন্দ্রে বসে সিলেব্‌ল তৈরি করতে পারত বলেই, তোমরা কী বুঝবে? ওসব কথা ছেড়ে বরং ঋ-এর বাংলা উচ্চারণের কথাই কও।"

"ঋ-এর উচ্চারণ 'রি'—এ ছাড়া আমি তো আর কোনো কথাই খুঁজে পাচ্ছি না—" বাবা বললেন ঠাট্টার সুরে, "কাজেই 'ঋণ' হল [রিন], 'ঋষি' হল [রিশি], কৃত হল [ক্রিতো], নৃপ হল [ন্‌রিপো] বা [ন্রিপো], 'ভৃত্য' হল [ভ্রিত্তো]! এতে

কার সমস্যা কোথায় দেখছিস তুই?"

"আছে গো সমস্যা, আছে আছে।" হিগিনকাকু মাথা দুলিয়ে বলে উঠলেন, "ধরো 'বিকৃত' কথাটার উচ্চারণ তুমি কী ভাবে লিখে বোঝাবে?"

"কেন? 'বিক্রিতো'?"

"আর 'বিক্রীত' অর্থাৎ 'যা বিক্রি করা হয়েছে', এ কথাটার উচ্চারণ?"

"সেও তো 'বিক্রিতো'-ই হবে।"

"অর্থাৎ তুমি ঋ-কার আর র-ফলায় হ্রস্ব-ইকার বা দীর্ঘ-ঈকার-এর উচ্চারণ একই ধরছ।"

বাবা বললেন, "তাছাড়া আর কী হবে?"

"হয়নি, হয়নি, ফেল্! ফেল্!" বলে উঠলেন হিগিনকাকু। "ঋ-কার আর র-ফলায় হ্রস্ব-ই বা দীর্ঘ-ঈ উচ্চারণ কক্ষনো হুবহু এক নয় বাংলায়। শব্দের গোড়ার ব্যঞ্জনে থাকলে এক, কিন্তু শব্দের মধ্যে নয়।"

"সে আবার কী?" বাবা প্রশ্ন করলেন।

"আরেব্দাদা, সে এক কেলেঙ্কারি। শব্দের মাঝখানে র-ফলা থাকলেই র-ফলাওয়ালা ব্যঞ্জনটা দুনো হয়ে যাবে বাঙালির উচ্চারণে। যেমন 'মিত্র' উচ্চারিত হবে [মিৎ+ত্রো], পুত্র [পুৎ+ত্রো], তীব্র [তিব্+ব্রো], অভিপ্রায় [ওভিপ্+প্রায়্]। কিন্তু ঋ-ফলার বেলায় তার ব্যঞ্জন দুনো হবে না উচ্চারণে। যেমন 'বিকৃত' হবে [বি-ক্রিতো], কিন্তু 'বিক্রীত' উচ্চারিত হবে [বিক্+ক্রিতো]। তেমনি 'আবৃত্তি' হবে না [আব্+বৃত্তি], না হবে [আব্+বৃত্তি] ; হবে সোজাসুজি [আ-ব্রিত্তি]। 'ব্রি' বলতে হবে আল্‌তো করে, জোর দিয়ে নয়। তেমনি 'প্রকৃতি' [প্রোক্‌ক্রিতি] নয়, [প্রো-ক্রিতি]; স্বীকৃতি [শিক্‌ক্রিতি] নয় [শিক্রিতি]। 'আবৃত' [আব্‌ব্রিতো] নয়, [আ-ব্রিতো]" তেমনি অপসৃত হবে অপো-স্রিতো, কিন্তু খরস্রোত হবে খরোস্-স্রোত্।

"ই কী কাণ্ড রে বাবা।"

"হুঁ খুব সাবধান!" এই উচ্চারণগুলো পাশাপাশি করে প্র্যাক্‌টিস করো :

বিকৃত	বিক্রীত, বক্র
আবৃত্তি	তীব্র
ব্যাপৃত	বিপ্র
আকৃতি	আক্রা
সুতৃপ্তি	কুত্রাপি।"

হিগিনকাকু ভয় দেখালেন, "নইলে বিবৃতিতে বিব্রত হবে।"

ব্যঞ্জনের ভাগাভাগি

"বাংলা ব্যঞ্জনগুলোকে যদি সাজাতে হয়", হিগিনকাকু বললেন ভন্টুকে, "তাহলে কী অনুযায়ী সাজাব, সাজানোর মাপকাঠিগুলো কী কী হবে, আর একবার বলে দাও বাবা।"

ভন্টু বলল, "মাপকাঠি তো দুটো—উচ্চারণের স্থান, আর উচ্চারণের ধরন—তাই না?"

"হাই, হাই!" জাপানি ভাষার হ্যাঁ হ্যাঁ বলে উঠলেন হিগিনকাকু। "এখন ধরো কতকগুলো ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময় মুখ থেকে বাতাস বেরুনোর রাস্তা একদম বন্ধ হয়ে তারপর খুলে যায়—যেমন প্, ত্, ক্, ব্, দ্, গ্, ইত্যাদি। দ্যাখো উচ্চারণ করে। ঠোঁট বা জিভ মুখের পথ পুরো আটকে দিচ্ছে কোথাও-না-কোথাও, আওয়াজ বেরোবার রাস্তাই থাকছে না। পরে ওবিশ্যি মুখ খুলে গিয়ে আওয়াজটা পাচ্ছি আমরা। এগুলোর নাম স্পর্শধ্বনি। ইংরিজি নামটা বেশ পরিষ্কার—Stops। Mutes ও বলে। অর্থাৎ উচ্চারণের সময় মুখ থেমে যায় বা 'বোবা' হয়ে যায়।"

"বেশ, বাংলায় স্পর্শধ্বনি বা ওই Stops কটা হল তাহলে?" বাবার প্রশ্ন।

"গুনে যাও—ক্ খ্ গ্ ঘ্, ট্ ঠ্ ড্ ঢ্, ত্ থ্ দ্ ধ্, প্ ফ্ ব্ ভ্ ব্যস, এই ষোলোটা।"

"সে কী? তবে যে—"

"ওসব 'তবে-ফবে' ছাড়ো তো বড়দা! ইশকুলের ব্যাকরণের কথা বলছ তো? সেখানে কী বলে? বলে ক্ থেকে ম্ এই পঁচিশটা স্পর্শবর্ণ—তাই না? ওটা সংস্কৃতর বেলায় খাটে, বাংলায় না। ব্যাকরণে যে বলে 'স্পর্শবর্ণ' তারও কোনো মানে হয় না। আরে 'বর্ণ' তো ধ্বনি নয়, 'বর্ণ' হল যেটা লেখায় দেখছি সেটা, অক্ষরের চেহারাটা। সেটা 'স্পর্শ'ই বা হবে কী করে আর 'বিস্তৃত'ই বা হবে কী করে?"

"'বিস্তৃত' মানে? 'বিস্তৃত' আবার কোন্ ব্যঞ্জনগুলো?" ভন্টু একটু অস্থির হয়ে উঠল।

"সরি খুড়োমশায়, 'বিস্তৃত' কথাটা ব্যাকরণে নেই। ওটা আমি বানিয়েছি। যে-ব্যঞ্জনগুলো টেনে লম্বা করে উচ্চারণ করা যায় সেগুলোই স্পষ্ট হল না বিস্তৃত। ইংরেজিতে Continuant। যেমন ধর্ ঙ্, ন, ম, ল, শ ; স্পর্শ ব্যঞ্জনকে আমি বলি 'বাধিত' ব্যঞ্জন, আর ওই টানা ব্যঞ্জনকে বলি 'বিস্তৃত' ব্যঞ্জন।"

ভন্টুর বাবা প্রশ্ন করলেন, "বাংলায় টানা ব্যঞ্জন, অর্থাৎ ওই 'বিস্তৃত' ব্যঞ্জন তাহলে কী কী হল?"

"কেন, ওই ঙ, ন, ম, ল, শ আর স—স-এর উচ্চারণ ইংরিজি 'S'-এর মতো ধরছি।"

ভন্টুর হঠাৎ খটকা লাগায় সে বলে উঠল, "আচ্ছা, চ ছ জ ঝ কোথায় গেল?"

হিগিনকাকু ভুরু নাচিয়ে হেসে বললেন, "যাবে আবার কোথায়? সব বেটাকে কান ধরে হিড়হিড় করে এনে হাজির করব না? ওরা হল ঘৃষ্ট ধ্বনি। আমি বলি 'ঘর্ষিত'। ইংরেজি নাম affricates। 'ঘৃষ্ট' বা 'ঘর্ষিত' কেন জানো? এগুলো বলতে গিয়ে জিভ প্রথমে মুখের পথ আটকে দেয়, পরে বাতাস তাকে ঠেলেঠুলে ঘষে বেরিয়ে যায়। কিন্তু—" বলে হিগিনকাকু বললেন "আমার জিভ এখন এসব ঘষাঘষি চাইছে না, চাইছে কালো কফি।"

আরও সূক্ষ্ম ভাগ
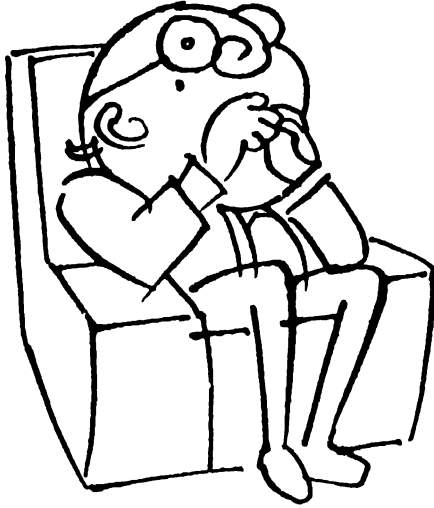
হিগিনকাকুর জিভ যে শুধু কালো কফি খেয়ে শান্ত হল তা নয়, সেই সঙ্গে রান্নাঘর থেকে আসা খান-পনেরো গরম-গরম পেঁয়াজিও বেশ রসিয়ে খেল। তারপরে একটা মস্তবড় দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল তাঁর বড়সড় বুকখানা থেকে। চোখ দুটিও বুজে ফেললেন সুখে। সেই অবস্থাতেই বললেন, "কী হচ্ছে?"

ভন্টু বলল, "ব্যঞ্জন—"

"আহা ব্যঞ্জন তো বুঝলাম, কিন্তু কী ব্যঞ্জন?"

"ওই তুমি কী-সব বলছিলে, 'বাধিত', 'বিস্তৃত' কী যেন সব?"

হিগিনকাকু মিটিমিটি হেসে বললেন, "আরে আমি অন্য ব্যঞ্জনের কথা বলছি না, অন্নব্যঞ্জনের কথা বলছি। কী রান্না হচ্ছে?"

ভন্টুর বাবা হেসে ফেলে বললেন, "শিবরাম চক্রবর্তী তোর ওপর আবার ভর করলেন কেন? যা হচ্ছে ভালোই হচ্ছে, তোর ভাবনার কিচ্ছু নেই। তুই এখন এই ব্যঞ্জনের কথা বল্—"

"হ্যাঁ, ধ্বনির ব্যঞ্জনের কথা—" ভন্টু জোর দিয়ে বলল।

হিগিনকাকু আরেকটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। অভিমানী চোখে বললেন, "নাঃ, বড্ড বেরসিক তোমরা। যাই হোক, ধরো—প্রথমে দুটো ভাগ : 'বাধিত' আর

'বিস্তৃত' ব্যঞ্জন—ইংরেজিতে stops আর continuants। 'বাধিত' হল ক্ খ্ গ্ ঘ্ ট্ ঠ্ ড্ ঢ্ ত্ থ্ দ্ ধ্ প্ ফ্ ব্ ভ—এই ষোলোটা। 'বিস্তৃত' হল ঙ, ন, ম, ল, শ (স), হ—এই ছ-টা। 'স'-কে আমি শ-এরই একটা বিশেষ রূপ ধরছি।"

"আর ঘর্ষিত?" ভন্টুর প্রশ্ন শোনা গেল।

"ঘর্ষিত বা affricate হল চ্, ছ্, জ্, ঝ্।"

"ব্যস্, এই?"

"না রে দাদা। এবার বাধিত আর ঘর্ষিতগুলোর মধ্যে আবার উচ্চারণের ধরন অনুযায়ী সাজাও—'অল্পপ্রাণ' : ক্ গ্, চ্, জ্, ট্, ড্, ত্, প্, ব্—এই ক-টা; মহাপ্রাণ অর্থাৎ যেগুলো উচ্চারণে মুখের রাস্তা একটু শক্ত হয়ে আটকে যায় বলে বাতাস একটু জোরে ধাক্কা দিয়ে বেরোয়—খ্, ঘ্, ছ্, ঝ্, ঠ্, ঢ্, থ্, ধ্, ফ্, ভ্; 'ঘোষবৎ', অর্থাৎ যেগুলোর উচ্চারণে গলার স্বরতন্ত্রী—মানে এখনকার ভাষায় যাকে বলে 'ভোক্যাল ফোল্ড্স'—বাংলায় বলব ধ্বনিদ্বার—যে দুটো একটু রিন-রিন আওয়াজ করে কাঁপে—গ্, ঘ্, জ্, ঝ্, ড, ঢ, ড়্, ঢ়, দ্, ধ্, ব্, ভ্। মনে রাখবে স্বরধ্বনি আর নাসিক্যধ্বনি হল 'সঘোষ' অর্থাৎ সেগুলোর উচ্চারণে ধ্বনিদ্বারে আওয়াজটা একটানা হয়। কিন্তু 'ঘোষবৎ' ব্যঞ্জনে ওই আওয়াজটা আংশিক। 'অঘোষ' ব্যঞ্জনে ওই আওয়াজ হয়ই না—যেমন ক্ খ্ চ্ ছ্ ট্ ঠ্, ত্, থ্, প্ ফ্, শ্ (স)। নাসিক্য ব্যঞ্জন হল ঙ, ন, ম—উচ্চারণে বাতাসটা বেরোয় নাক দিয়ে। 'ল' হল 'পার্শ্বিক' ব্যঞ্জন—বাতাস জিভের পাশ দিয়ে বেরোয় বলে। 'র' হল 'কম্পিত' (trill), ড়্, ঢ়্, হল 'তাড়িত' (flapped) ; শ (স) আর হ হল উষ্মব্যঞ্জন (fricative)—তার মধ্যে শ্ (স্)-কে বলে শিস্ধ্বনি (Sibilant)।"

"সব গুলিয়ে ফেলব কাকু!" ভন্টু আর্তনাদ করে উঠল।

"ঠিক আছে, মা ভৈঃ। ছক করে সাজিয়ে দিচ্ছি।"

মিথ্যেবাদী দন্ত্য-ন

"কিংবা ছকের কী দরকার?" হিগিনকাকু ভন্টুকে বললেন, "তুই বাবা দুটো ঠোঁট চেপে বোস তো, যেন মুখে মশা না ঢুকে যায়—বড্ড মশা এসেছে ঘরে।"

ভন্টু ভয় পেয়ে ঠোঁট চেপে বসল। হিগিনকাকু বললেন, "এবার বল্‌ তো প্‌ ফ্‌ ব্‌ ভ্‌ ম্‌।" ভন্টু বলতেই জিজ্ঞেস করলেন, "এই যে পাঁচটা আওয়াজ হল, কোথায় হল?"

"কেন, দুই ঠোঁটে!"

"বেশ! ঠোঁটের ভালো নাম কী?"

ভন্টু মাথা চুলকোচ্ছিল, কাজেই বাবা বলে দিলেন, "ওষ্ঠ!"

"অ্যা-ই! ওষ্ঠ! কাজেই, ওই পাঁচটা ব্যঞ্জন হল ওষ্ঠ্য বঞ্জন! ইংরেজিতে labial। বুইলে বাপধন? 'ওষ্ঠ' থেকে বিশেষণ ওষ্ঠ্য! আচ্ছা, এবার বলো ত থ দ ধ।"

হিগিনকাকুর দেখাদেখি ভন্টু উচ্চারণ করল, 'ত থ দ ধ'।

"এবার বলো কে কাকে ছুঁচ্ছে।"

ভন্টু বলল, "জিভের সামনেটা ছুঁচ্ছে ওপরের দাঁতের পাটির পেছনটাতে।"

"গুড্‌! দাঁতকে মুনিঋষিরা কী নামে ডাকতেন?"

এবার ভন্টু হেসে বলল, "কেন, দন্ত!"

"হ্যাঁ রে দাদা! তাহলে ত থ দ ধ হল দন্ত্য ব্যঞ্জন। ইংরেজিতে 'dental'।"

হঠাৎ ভন্টুর মাথায় কী যেন একটা ঝলক খেলে গেল। সে প্রায় ব্যাকুলভাবে ঝাঁপিয়ে পড়ল কথাটার ওপর। বলল, "কিন্তু কাকু, দন্ত্য-ন'র কথা তো বললে না তুমি। সেটাও একই জায়গায় উচ্চারণ হচ্ছে, নামই তো দন্ত্য-ন।"

হিগিনকাকু হঠাৎ একটা হুংকার দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে চোখ পাকিয়ে বিড় বিড় করে বকতে লাগলেন, তারপর দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "অবৈজ্ঞানিক, অবৈজ্ঞানিক!"

বাবা হিগিনকাকুর এসব পাগলামিতে মাথা ঘামাতেন না। ভন্টু একটু ঘাবড়ে গেলেও তিনি হাসিমুখে বললেন, "হয়েছে এখন। ছেলেটার কথার জবাব দে।"

"আরে দাদা, উচ্চারণ করো তো 'ন'। দ্যাখো তো জিভ কোথায় গিয়ে ছুঁচ্ছে? দাঁতের পেছনে কি?"

ভন্টুর বাবা 'ন' বলেই থেমে গেলেন। তারপর আবার 'ন' বলতে গিয়ে বললেন, "ন্-ন্-না—। মনে হচ্ছে ওপরের দাঁতে পার্টির পেছনে শক্তমতন যে ঢিবিটা আছে সেখানে লাগছে। দাঁতের গোড়ায়।"

"অ্যা—ই। গোড়া মানে মূল। দন্তমূল। কাজেই বাংলা 'ন' হল দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন। মোটেই সে দন্ত্য-ন নয়। অ্যাদ্দিন সে নিজেকে দন্ত্য বলে চালাবার চেষ্টা করেছে, কিন্তু এখন আমরা তার চালাকি ধরে ফেলেছি। ওই ঢিবিটার ইংরেজি নাম alveolum।" তা থেকে দন্তমূলীয়-র ইংরেজি হল alveolar।"

বাবা গালে হাত দিয়ে বসলেন, যেন হঠাৎ দাঁতের ব্যথা উঠল তাঁর।

দম-আটকানোর খেলা

"তাহলে বুঝেছ তো, ব্যঞ্জন উচ্চারণের সময় মুখের কোন্ জায়গায় ছোঁওয়া লাগছে, কোথায় হাওয়ার (দমের) রাস্তা আটকে যাচ্ছে, সেই অনুযায়ী ব্যঞ্জনের ভাগ হচ্ছে। নীচের ঠোঁট (অধর) এসে ছুঁচ্ছে ওপরের ঠোঁট (ওষ্ঠ)-কে, তৈরি হচ্ছে ওষ্ঠ্য ব্যঞ্জন। জিভের আগা ছুঁচ্ছে দাঁতের ওপরপাটির পেছনে, হচ্ছে দন্ত্য ব্যঞ্জন। জিভের আগা ছুঁল দাঁতের গোড়া—হয়ে গেল দন্তমূলীয় ব্যঞ্জন, 'ন্'। আর-একটা দন্তমূলীয় ব্যঞ্জনও বাংলায় শুনতে পাই আমরা—"

"এরপরে আরও? বাপ্‌স্"—ভন্টুর বাবা রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছলেন।

"বাঃ, ঠিক ধরেছ তো বড়দা। ওই বাপ্‌স্-এর স্—ইংরেজি [S]-এর মতো যেটা। স্তব, স্থান্, স্নান, শ্রী, শ্লীল-এ যাকে উচ্চারণ করি—'স্যামবাজারের সসিবাবু'তে যাকে ঠাট্টা করি।"

"ইনি দন্ত্য-স, তাই না?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

“অ্যাইও—খপরদার!” ধমকে উঠলেন হিগিনকাকু, “কে বলে দন্ত্য-স? এটাও দন্তমূলীয় স। আমাদের উচ্চারণ ‘ন্’ ‘স্’, কোনোটাই কিন্তু এ দুয়ের উচ্চারণ ঠিক একভাবে হয়? ‘দন্ত’ নয়।”

“বাঃ, তাহলে তো দন্ত্য-ন, দন্ত্য-স দুজনেরই ছদ্মবেশ ধরা পড়ে গেল!” ভন্টু হাততালি দিয়ে উঠল।

“হ্যাঁ, আর যেন কক্ষনো ভুল না হয়। তবে এই সঙ্গে র আর ল-ও দন্তমূলীয়, সেটাও খেয়াল রেখো তোমরা।” বলে একটু থেমে হিগিনকাকু বলতে শুরু করলেন, “তারপর ধরো মূর্ধন্য ব্যঞ্জন। আমাদের মুখের উচ্চারণে এই ক-টা রয়েছে, ট, ঠ, ড্, ঢ্, ড়্, ঢ়্।—ইংরেজিতে সেরেব্রাল বা রেট্রফ্লেক্স (Retroflex)। ‘মূর্ধন্য’ নাম কেন হল বাপু ভন্টুসোনা?”

ভন্টু একবার জিভ দিয়ে নিজের মনে ‘ট্ ঠ্’ ইত্যাদি বলে নিল। তারপর ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করল, “এগুলো বলবার সময় জিভ সেখানটায় ছুঁচ্ছে সে-জায়গাটার নাম কি মূর্ধা?”

“ফাসক্লাস! ফাসক্লাস!” হিগিনকাকু ভন্টুর পিঠ চাপড়ে বললেন, “তাহলে চ্ ছ্ জ্ ঝ্ শ্ এই ‘তালব্য’ ব্যঞ্জনগুলোর বেলায় জিভ ছুঁচ্ছে কোথায়?”

“তালুতে?”

“একশোবার তালুতে। আর ক্ খ্ গ্ ঘ্ ঙ্—এই ‘কণ্ঠ্য’ ধ্বনিগুলোর বেলায় জিভের ঠিকানা?”

“কণ্ঠ, মানে গলায়?”

“না রে খুড়ো। তালুর পেছন দিকে। ওটাকে বলে নরম তালু—আলজিভের গোড়ায় ওপরটায়। ‘হ’-এর বেলায় একদম ধ্বনিদ্বারে বেশ নীচে। ফলে তার নাম ‘পশ্চাৎকণ্ঠ্য’ বা কণ্ঠমূলীয় (glottal) ধ্বনি।”

উচ্চারণের জায়গা (place of articulation) অনুযায়ী এই হল ব্যঞ্জনের ভাগ, বুঝলে। এখন খবর নাও, রান্নাঘরের ব্যঞ্জনের কদ্দূর কী ভাগ হল।” বলে সোফায় গা এলিয়ে দিলেন হিগিনকাকু।

উচ্চারণে মোমবাতি

জিভের দু-রকম ব্যঞ্জনেরই—উচ্চারণের আর রান্নাঘরের—স্বাদ নেওয়া হয়ে গেছে হিগিনকাকু, ভন্টু আর ভন্টুর বাবার, ড্রইংরুমে এসে বিশ্রাম করছেন তিনজনে। হিগিনকাকু আবার একটু কালো কফির এত্তেলা পাঠিয়েছেন। ভন্টুর বাবা বললেন, "তাহলে আমরা কি সব ব্যঞ্জন হজম করে ফেললাম, আর কিচ্ছু বলবার নেই ওদের নিয়ে?"

হিগিনকাকু মিটিমিটি তাকিয়ে বললেন—"না, পুরো হজম আর কোথায় হল—এবার উচ্চারণ নিয়ে কথাবার্তা শুরু করতে হবে। স্বরধ্বনির উচ্চারণ যেমন ভুল হয়, ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণেও তেমনি ভুল হতে পারে তো!"

"সে কী রে? ক খ বলতে কেউ আবার ভুল করে নাকি?"

"বড়দা, তুমি ভুলে যাচ্ছ যে, বাংলায় যারা কথা বলে তারা বেশিরভাগ স্ট্যান্ডার্ড বাংলা জানে না। ফলে স্ট্যান্ডার্ড বাংলা ব্যঞ্জনের উচ্চারণেও তাদের ভুল হয়।"

"কী রকম?"

"এই ধরো মহাপ্রাণ ব্যঞ্জন। আমরা সবাই জানি খ ছ ঠ থ ফ, আর ঘ ঝ ঢ ধ ভ বাংলার মহাপ্রাণ ব্যঞ্জনধ্বনি। সেই সঙ্গে ঢ়-কেও ধরে নিতে হবে। আমরা পুব-বাংলার লোকেরা খ ঠ থ ফ (ছ, ঝ নিয়ে অন্য মুশকিল আছে) কোনোরকমে

বলতে পারলেও ঘ ঢ ধ ভ কি ঠিক ঠিক উচ্চারণ করতে পারি? পারি না। 'ঘরে গিয়ে ঘুমোও'-কে বলি 'গরে গিয়া গুমাও।' হয়তো এই গ-টা একটু অন্যরকম, এতে খানিকটা ঠেলা আছে, তবুও তা ঠিক ঘ নয়।"

"তা ঠিক ঘ-টা কী-রকম উচ্চারণ হবে?"

"যেখানে ঘ-এর উচ্চারণ সেখানটা জিভের গা দিয়ে আরও জোরে ঠেসে ধরতে হবে, তারপর দমের বাতাস বেশ জোরে ধাক্কা দিয়ে বেরিয়ে আসবে। যেন বিস্ফোরণের মতো আওয়াজ হয়। মনে রাখবে, মহাপ্রাণ ধ্বনির ঠিক ঠিক উচ্চারণ বাঙালির বীরত্ব দেখানোর একটা-সুযোগ।"

বাবা আর ভন্টু দুজনেরই হাসি পেল। সেটা থামাতে হিগিনকাকু বললেন, "মুখের সামনে একটু তুলো, বা একটা জ্বলন্ত মোমবাতি ধরে থাকো। দেখবে 'গ' বলতে তুলো বা মোমবাতির শিখা যত কাঁপছে, 'ঘ' বলতে তার চেয়ে অনেক বেশি কেঁপে যাচ্ছে সে-সব। মহাপ্রাণ উচ্চারণের স্লোগান হল, মুখের ভেতরে জোরে পথ আটকাও, তারপর ধাক্কা দিয়ে দম ছাড়ো।"

ভন্টু রসিকতা করল, "তুলোর চেয়ে মোমবাতিই ভালো। লোডশেডিং-এর ভয়ে বাড়িতে মোমবাতি আনা থাকে।"

তারপর ড্রয়িংরুমে একটা অদ্ভুত কাণ্ড চলতে লাগল। মোমবাতি ধরিয়ে দুটি বয়স্ক লোক আর একটি বালক ক, খ, ঢ, ড, ব, ভ ইত্যাদি বলে মুখের সামনে এনে মোমবাতির শিখা ছিটকে-ছিটকে দিতে লাগল। বাড়ির সকলে এসব বিদ্‌ঘুটে আওয়াজ শুনে ছুটে এসে তাজ্জব হয়ে তাকিয়ে রইল।

ফোকলা ফ-এর ফ্যাসাদ

পরের ছুটির দিন জানলা দিয়ে হিগিনকাকুকে আসতে দেখেই ভন্টু বোম্ ফাটানোর মতো আওয়াজ করে চেঁচিয়ে খ ছ ঠ থ ফ আর ঘ ঝ ঢ ধ ভ বলতে শুরু করে দিল। ঠাম্মা আর মা রান্নাঘর থেকে চেঁচাতে লাগলেন, ঠামা—' "গরে কি ডাকাইত পরসে, কান ত Zালাপালা অইয়া গেল' আর মা—'কী হচ্ছে ভন্টু, ফের এ রকম চেঁচাবি তো—' বলে। ভন্টু সবে ঠাম্মাকে শুধরে দিয়েছে, "না ঠামা, 'গর' নয় 'ঘর', 'পরসে' নয়, 'পড়েছে', 'Zালাপালা' নয়, 'ঝালাপালা'—" এমন সময় হিগিনকাকুর প্রবেশ। ভন্টুর মাস্টারি সবটাই তাঁর কানে গিয়েছিল, তার মাথাটা ধরে একটু আদর করে ঝাঁকিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, "বৃদ্ধা আর বালিকা (অর্থাৎ ঠাম্মা আর মা) দুজনেই ভুল করেছে। তবে দুজনের দু রকমের ভুল।" বলা বাহুল্য, 'ভুল'-এর 'ভ'-টাকেও বোম্ ফাটানোর মতো করেই ছাড়লেন তিনি—তাতে মুখের কাছে উড়তে থাকা একটা নীল মাছি ছিটকে গিয়ে দেয়ালে ধাক্কা খেল আর সম্ভবত অনন্তধামে প্রয়াণ করল। ভন্টু বলল, "বাঃ কাকু, ঠাম্মার ভুলটা না হয় বুঝলাম, কিন্তু মার কোথায় ভুল হল?"

"হয়েছে, হয়েছে!" বলে হিগিনকাকু ডান হাতটা বুদ্ধদেবের মতো করে তুলেই বললেন, "বউদি ফ বলতে গিয়ে ইংরিজি 'f'-এর আওয়াজ করেছে, অর্থাৎ কিনা ফোকলা-ফ ওটা, বাংলা ফ-এর বোম-ফাটানো উচ্চারণ করেনি।"

বাবা ফটাস করে খবরের কাগজটা নামিয়ে বললেন, "দুয়ের তফাত?"

"তফাত হল, বাংলা 'ফ' স্পৃষ্ট বা বাধিত ব্যঞ্জন—দুটো ঠোঁট শক্ত এঁটে যায়, তারপর ওই বোম-ফাটানো আওয়াজ করে ফ-এর উচ্চারণ করে। এটা হল ভালো পটকার আওয়াজ। আর ইংরেজি f হল উষ্মব্যঞ্জন। তাতে নীচের ঠোঁট ওপরের দাঁতের পাটির সঙ্গে আল্‌তো এসে লাগে—তা দিয়ে ফুঁ-এর মতো বাতাস বেরুতে পারে। তার হল ভেজা পটকার আওয়াজ। এ-আওয়াজ বাংলা শুদ্ধ উচ্চারণে চলবে না।"

"তাই নাকি? অনেকেই যে 'ফুল'-কে fool বলে আর 'ফল'কে fall? তা বলবে না?"

"না রে দাদা, আর তফাতও নয়, তুমি যা বললে, হবে তফাত। বাংলায় ওই উচ্চারণ।"

"ফাইন!"—বাবা এবার ঠিক ইংরেজি উচ্চারণ বলার সঙ্গে সঙ্গে টলমল করে তিন্নি এসে ঢুকল। হিগিনকাকু তার গাল টিপে দিয়ে বললেন, "ফুলের মতো এই মুখটাকে যে 'fool-এর মতো মুখ' বলবে তার 'ফিফ্‌টি' রুপিজ 'ফাইন' আর ছ মাস সাতাশ দিনের ফাঁসি। ভন্টু এবার ধরতে পারল যে, কাকু f-এর জায়গায় ফ-এর জায়গায় 'f' বসিয়ে ঠাট্টা করলেন।

তারপর বললেন, "নাও বাংলা ফ আর ইংরেজি f-ওয়ালা শব্দ পাশাপাশি সাজিয়ে দিচ্ছি, প্র্যাকটিস করো। প্রথমটায় ঠোঁট বন্ধ হয়ে ফট্‌ করে খুলে যাবে, দ্বিতীয়টায় ফুঁয়ের আওয়াজ হবে—

ফুল	fool
ফ্যালো	fellow
ফাঁড়া	furrow
ফোঁকলা	fickle
ফল	fall
ফাল্গুন	falcon
ফোটে	photo

দুজনকে সাবধান

"এই দুজন সম্বন্ধে সাবধান। ফ আর ভ। মনে রেখো, ইংরেজিতে বাংলার ফ আর ভ নেই, আবার বাংলাতেও ইংরেজির 'f' আর 'v' নেই। বাংলা ফ আর ভ-এর আওয়াজ শুকনো পটকার ইংরেজি f আর v-র আওয়াজ ভেজা পটকার। আগের দুটো 'বাধিত' ধ্বনি—দু ঠোঁট একেবারে সেঁটে গিয়ে তারপর হাওয়ায় ধাক্কায় খুলে যায়। আর f আর v এক ধরনের 'বিস্তৃত' ধ্বনি—নীচের ঠোঁট ওপরের দাঁতের আগায় আলতো লেগে থাকে। f-এর বেলায় ফুঁ-এর মতো, কিংবা ফুটবল-ব্লাডারের হাওয়া বেরুনোর মতো আওয়াজ করে খানিকটা, আর v-এর আওয়াজ তারই ঘোষবৎ রূপ। বুঝেছ বাছাধনরা?" এক নিশ্বাসে হিগিনকাকু জ্ঞান দিয়ে গেলেন।

ভন্টু বলল, "তাহলে কাকু, ফ-কে সবাই ইংরেজিতে f দিয়ে লেখে যে। আমাদের পাড়ার ক্লাব 'দক্ষিণ ফাল্গুনী'র প্যাডে ইংরেজিতে ফাল্গুনী বানান f দিয়ে।"

"ওটা খুব ভুল। লেখা উচিত Ph দিয়ে। Fanindra নয়, Phanindra, Shefali নয়, Shephali। যদিও আরবি-ফারসি নাম—যেমন ফিরোজ, ফরিদ—এগুলোতে F দেওয়া চলে। কারণ এগুলোর মূল উচ্চারণ ছিল f-এর মতো।"

"আর 'ভ' এবং 'v'?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

"উরি শাব্বাশ! দুটোকে গুলিয়ে ফেলা নৈব নৈব চ। 'শোভা' হবে Shobha,

Sova নয়। 'শৌভনিক' হওয়া উচিত ছিল Shaubhanik। 'বিভাস' হবে Bibhas, bivas কিছুতেই নয় Sourabh হওয়া উচিত, Sourav কক্ষনো নয়।"

বাবা বললেন, "এই খেয়েছে। তাহলে ইংরিজি v-এর বাংলায় কী গতি হবে?"

"তাকে যথাসম্ভব 'ব' দিয়ে লেখা ওভ্যেস করো রে দাদা। Bhavan-কে কি তুমি 'ভভন' লিখবে, nirvana (নির্বাণ)-কে 'নির্ভানা'? Vedas (বেদ)-কে 'ভেদস্'?" প্রায়ই দেখি Shiva, Shivam লেখা হয় 'শিভা', 'শিভম্'। এ কী ভয়ংকর কাণ্ড রে বাবা!

"কিন্তু তাই বলে 'ভলিবল'-কে 'বলিবল' লিখব? 'ভিক্টোরিয়া'কে 'বিক্টোরিয়া'? 'ভ্যালি'কে 'ব্যালি'? valve-কে 'বাল্ব' বললে bulb-এর সঙ্গে তা গুলিয়ে যাবে না? 'বাইস প্রেসিডেন্ট', 'বাইস চ্যান্সেলার' বললে ওঁরা খেপে যান যদি?"

হিগিনকাকু হাতজোড় করে বললেন, "উঃ বড়দা, থামো থামো। আর বললে আমি কেঁদে ফেলব একেবারে। আসলে কী জান—'ব'ই লেখা উচিত। বঙ্কিমচন্দ্র, এমনকি রবীন্দ্রনাথও একসময় ব দিয়ে লিখতেন। ঠিক লিখতেন। কিন্তু আমাদের তো ল্যাজ গজিয়েছে—

যাই হোক, বাংলা বম্-ফাটানো 'ভ' আর ইংরেজি হাওয়া বেরুনো 'v'-এর শব্দ পাশাপাশি সাজিয়ে দিচ্ছি—ওভ্যেস করে নাও উচ্চারণ

ভালো	value
ভানু	venue
ভাগ্	vague
ভীষণ	vision
ভীম	vim
ভিক্ষে	vicky
ভাই কার?	vicker।"

বাবা আরও বলতে যাচ্ছিলেন, হিগিনকাকু হাত তুলে তাঁকে থামিয়ে বললেন, "ঠিক আছে রে বাবা, শব্দের গোড়ায় 'ভ' লিখলেও লিখতে পারো, কিন্তু মাঝখানে 'ব'-ই লেখা উচিত। Larva 'লার্বা'-ই দেখতে চাই—না, এ নিয়ে আর তর্ক নয়", বলে চেঁচিয়ে উঠলেন, "কালো কফি—ই—ই—ই!"

ব্যাঙের শুদ্ধ ভাষা

এ-বাড়িতে ভাষাবিজ্ঞানের আসর বসার পর থেকে ১২৭তম কাপটির কালো কফি নিঃশেষ করে হিগিনকাকু বললেন, "এবার একটু ব্যাঙেদের ভাষাতত্ত্ব আলোচনা করা যাক।"

"অস্যার্থ?" (তার মানে?) বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

"এই ঙ-এর ব্যাপারটা। আমরা যারা বাঙাল, কিংবা যারা ধরো মেদিনীপুর অঞ্চলের মানুষ—আমাদের অনেকে ঙ-র ঠিক-ঠিক উচ্চারণ করতে পারি না, একটু ঝামেলায় পড়ি।"

ভন্টু বলল, "ঙ নিয়ে আবার কী ঝামেলা হল?"

"বলছি বাছা, বলছি। বলতে হবে 'ঙ', তা না বলে আমরা বাঙালরা বলি 'ঙ্গ', অর্থাৎ 'ঙ' প্লাস 'গ'। আমরা 'রাঙাদি' বলতে পারি না, বলি 'রাঙ্গাদি' [রাঙ্‌গাদি], 'ডাঙা' বলতে পারি না, বলি 'ডাঙ্গা' [ডাঙ্‌গা], 'রঙিন' বলতে গিয়ে বলি 'রঙ্গিন' [রঙ্‌গিন]—বুঝতে পারছ ঝামেলাটা কোথায়?"

বাবা বললেন, "দাঁড়া, দাঁড়া—মনে হচ্ছে একটা এক্‌সট্রা 'গ' চলে আসছে।"

হিগিনকাকু ভন্টুর বাবার মুখের দিকে মুগ্ধ হয়ে একমুহূর্ত তাকিয়ে বললেন, ইংরিজির বাংলা করে, "পেরেকের ঠিক মাথাটায় হাতুড়ি মেরেছ বড়দা! হ্যাঁ,

একথা অস্বীকার করব না, একসময় এগুলোর বানান লেখা হত ঙ-য় গ-এ—'ঙ্গ' দিয়ে। উচ্চারণও হয়তো ওই রকম হত। কিন্তু পরে উচ্চারণে 'গ্' খসে গেছে, বাকি আছে শুধু 'ঙ'। এর উচ্চারণে জিভের পেছনটা আলতো করে আলজিভের গোড়াকার নরম তালু ছুঁয়ে থাকবে—আর নাক দিয়ে সাইরেনের মতো আওয়াজ বেরুবে—ঙ্-ঙ্-ঙ্। পেছন-পেছন 'গ্' যেন না আসে! বর্ষাকাল, ব্যাঙেরা তাহলে ঠ্যাং কামড়ে দেবে।"

"অর্থাৎ", ভন্টুর বাবা বললেন, "ভাঙ্গা নয়, ভাঙা, বাঙ্গালি নয়, বাঙালি, শিঙ্গাড়া নয়, শিঙাড়া, ঝিঙ্গে নয়, ঝিঙে, ফিঙ্গে নয়, ফিঙে, চোঙ্গা নয়, চোঙা, আঙ্গুল নয়, আঙুল, লাঙ্গল নয়, লাঙল—এই তো?"

"হাই, হাই!" জাপানি ভাষায় হ্যাঁ-হ্যাঁ বললেন হিগিনকাকু। তারপর চোখ বুজে বক্তৃতা দিতে লাগলেন, "কিন্তু সমবেত ভদ্রমহিলা ও মহোদয়গণ এবং স্নেহের হিজবিজবিজ", বলে ভন্টুর থুতনিটা নেড়ে দিলেন—"মনে রাখবে 'সঙ্গে'ই ঠিক, 'সঙে' ভুল, এই রকম 'বঙ্গ', 'ভঙ্গ', 'জঙ্গল', 'ভঙ্গি', 'সঙ্গী'। এগুলো 'ঙ্গ' দিয়ে লিখবে, 'অনুস্বার +গ' দেবে না, আর উচ্চারণেও 'গ্'কে আনবে। আবার বানান উচ্চারণে দু'রকমই হয় 'সঙ্গিন', 'সঙিন', 'রঙ্গান', 'রঙন'। এগুলোতেও 'গ' একসময়ে পুরোপুরি কেটে পড়বে বোধ হচ্ছে। বাকি থাকবে ওই 'ঙ'।

"খবরদার, খবরদার! বাকিগুলোতে 'গ্' বলে ব্যাঙেদের গালাগাল খেতে যেয়ো না। 'গ' দিয়ে কত বিশ্রী সব গালাগাল আছে—গোরু, গাধা, গাড়ল—থাক বাবা আর বলব না!"

নাও, নাও, প্র্যাক্‌টিসের জন্যে শব্দ নাও বাপসকল—

লাঙল জঙ্গল
রাঙা-মা হাঙ্গামা
চ্যাঙাড়ি ক্যাঙ্গারু
সঙের সঙ্গের
রঙন বঙ্গ
রঙিন জঙ্গি
সঙিন সংগীত।
রাঙা দাঙ্গা

উস্‌সারণ Zেনে নাও

হিগিনকাকু আবার শুরু করেছিলেন, "আমরা বাঙালরা—" ভন্টু কান খাড়া করে দেখল যে না হিগিনকাকু 'বাঙ্গালরা' বলেননি—কিন্তু ভন্টুর বাবা হাত তুললেন। একটু মুখভার করে বললেন তিনি, "তুই কথায় কথায় আমরা 'বাঙালরা' 'বাঙালরা' করিস কেন বাপু। শুধু কি আমরাই ভুল উচ্চারণ করি?"

'আহা, তা কেন হবে বড়দা? ভুল উচ্চারণ আবার কী? তুমি নিজে তোমার বাড়িতে যে-বাংলা শিখেছ সেটা নন্-স্ট্যান্ডার্ড হতে পারে, কিন্তু ভুল নয়। বাঙালভাষায় বাঙাল উচ্চারণই ঠিক। গণ্ডগোল হয় তখনই যখন এক উপভাষার উচ্চারণ অন্য উপভাষায় চালিয়ে দিই আমরা। মান্য চলিতে কথা বলতে গিয়ে বাঙাল উচ্চারণ যেমন ভুল, বাঙালভাষা বলতে গিয়ে মান্য চলিত উচ্চারণ তেমনই ভুল।"

ভন্টু যেন কার কাছে "বন্যেরা বনে সুন্দর শিশুরা মাতৃক্রোড়ে" কথাটা সেদিন শুনল—এখানে সেই কোটেশনটা দেবার তার লোভ হল খুব, কিন্তু কিছুতেই সাহস করে উঠতে পারল না।

"এই ধরো চ, ছ, জ, ঝ, এই চারটে ধ্বনি—" হিগিনকাকু এবার আসল কথায় এলেন— "এগুলোকে আমরা খানিকটা ইংরিজি [S] আর [Z]-এর মতো উচ্চারণ

করি—আমরা বাঙালরা। চ-এর বেলায় [S]-টা একটু দুর্বল, জিভের আগা দাঁতের ওপর-পাটির পেছনে আর ঢিবিতে আলতো ছুঁয়ে থাকে। ছ-এ ওই [S] একটু তীব্র, জিভ ঢিবিটাকেই ছোঁয় মূলত। তেমনই জ্-এ [Z] দুর্বল, আর ঝ্-এ [Z] তীব্র। কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড ভাষায় চ্ ছ জ্ ঝ্-এর সঙ্গে আমাদের ওই [S]-এর তফাত কী জানো? আমরা [S] আর [Z] টেনে উচ্চারণ করতে পারি S-S-S-S, কিংবা Z-Z-Z-Z। চ ছ জ ঝ সেভাবে টেনে উচ্চারণ করা যায় না। এগুলো বলতে গিয়ে জিভের আগা প্রথমে তালুর আগার দিকটাকে শক্ত করে সেঁটে ধরে, তারপর আলতো ঘসে ছেড়ে দেয়।"

ভন্টু বলল, "তাই বুঝি এগুলোর নাম 'ঘৃষ্ট'?"

"নিস্সে, নিস্সে!" হিগিনকাকু নেপালি ভাষায় 'নিশ্চয়ই' 'নিশ্চয়ই' বলে ভন্টুর মাথা নেড়ে দিয়ে বললেন, "উৎকৃষ্ট! তোমার উত্তরে আমি অত্যন্ত হৃষ্ট! খেতে দেব চকোলেট মিষ্ট!"

"ইংরিজিতে affricate।" ভন্টু নিজের জ্ঞান পুরোপুরি ঝেড়ে জানিয়ে দিল।

"হ্যাঁ, কিন্তু [S] আর [Z] fricative—উষ্ম ব্যঞ্জন। চ ছ ইত্যাদির বেলায় জিভের আগা তুলে টাক্রায় শক্ত করে লাগিয়ে তার পর ঘসে আওয়াজ করো, S Z-এর মতো টানা আওয়াজ কোরো না।"

বলে হিগিনকাকু একটু দয়ার স্বরে বললেন, "চ ছ জ ঝ বেশ জটিল ব্যঞ্জন—দেখিস না বাঙালি বাচ্চারা কত দেরি করে এগুলো বলতে শেখে! তিন্নি তো এখনও 'চা'-কে বলে 'তা'।"

ড়-এর দোষ

কফি শেষ করে হিগিনকাকু চেয়ারে গা এলিয়ে দিলেন, চোখ বুজলেন একটু। তারপর বললেন, "কিন্তু ড়-কে নিয়ে কী করা যায়? এবং ঢ-এ শূন্য ঢ়-র ব্যবস্থাই বা কী হবে? এই নিয়ে দেশের নেতারা খুব উদ্‌বেগ প্রকাশ করছেন।" হিগিনকাকু রেডিয়োর বাংলা খবর পড়ার ঢঙে বললেন।

ভন্টুর বাবা বললেন, "মানে?"

"এই ধরো আমরা বাঙালরা (বাবা স্বগতোক্তি করলেন 'উঃ আবার!') ড-এ শূন্য ড় উচ্চারণ করতে পারি না। 'বাড়ি'-কে বলি 'বারি', 'কাড়াকাড়ি'-কে 'কারাকারি', 'হার'। তা পারি না পারি না, সেজন্যে ঠাট্টাও শুনি। কিন্তু পশ্চিম বাংলারও অনেকে যে 'র' আর 'ড়'-এ গুলিয়ে ফ্যালে, তাও কিন্তু ঠিক। কবি সুনির্মল বসু একবার এইভাবে 'সোনার তরী' কবিতার প্রথম স্তবক আবৃত্তি করে

শুনিয়েছিলেন, 'গগনে গড়জে মেঘ ঘন বড়ষা' ইত্যাদি। তাতে ছিল 'ভড়সা', 'ড়াশি ড়াশি ভাড়া ভাড়া, ধান কাটা হল সাড়া।' শুনে আমরা হেসে আকুল।"

ভন্টু বলল, "তা 'র' আর 'ড়' তফাত রাখব কী করে, সেইটে বুঝিয়ে বলো না।"

"বলছি বাপু, বলছি", বলে ভন্টুর থুতনি নেড়ে দিয়ে বললেন, "ছেলের দেখছি আর তর সয় না। বুঝে নাও জিনিসটা। আমার এই জিভের আগাটা লক্ষ করো। যখন র বলছি, তখন জিভের আগা ওপরের দাঁতের গোড়ায় ওই যে ঢিবিটা—যার নাম দন্তমূল—সেখানে ঠোক্কর মেরে আসছে। জিভ নীচের থেকে ওপরে উঠছে, তার আগা ওই চিত অবস্থাতেই ছুঁয়ে আসছে দন্তমূল। কিন্তু 'ড়'-এর বেলায়? হুঁ-হুঁ বাবা, তখন জিভ কী করছে বলো তো?"

"কী করছে?"

"জিভের আগা উঠে গিয়ে আরও পেছনে, মুখের ছাদটা যেখানে হঠাৎ গর্ত মতন শুরু হয়েছে সেইখানে একটা ঠোক্কর মারছে। কিন্তু ঠোক্কর মারছে আগার ওপরটা দিয়ে নয়, তলার দিকটা দিয়ে। র-এর বেলায় আগার ওপর-দিকটা ছুঁয়ে আসছে দাঁতের ঢিবিতে, ড়-এর বেলায় উলটে গিয়ে জিভের আগার তলার দিকটা ঠোক্কর মেরে আসছে আরও পেছনে।" বলে হিগিনকাকু র-ড়, র-ড় করে দেখাতে লাগলেন, ভন্টুকে বললেন, "রোজ পাঁচশো বার এই ছড়াটা বলবি :

হকারেরা বাড়ি ফেরে
দুপুরের গাড়ি ধরে
সরকারি পুলিশেরা
নেড়ে দেয় দাড়ি ধরে।
হকারেরা বাড়াবাড়ি
দেখে খুব আড়ি করে,
পুলিশেরা বড় রাগে
মুখ থাকে হাঁড়ি করে।
তারপর কড়াকড়ি
বাবু ছোটে পড়িমরি,
সরে পড়ে তড়িঘড়ি
নিজেদের নাড়ি ধরে।

আচ্ছা, এটা মুখস্থ করবেই, সঙ্গে সঙ্গে পাশাপাশি প্র্যাকটিসও করবে এসব শব্দ বলে বলে—

পরা	পড়া
মরা	মড়া
কারাগার	কাড়াকাড়ি
বেরোল	বেড়াল
সারা	সাড়া
বরাবরই	বাড়াবাড়ি
নারী	নাড়ি।

"আর ঢ-এ শূন্য ঢ়?" ভন্টু জিজ্ঞেস করল।

"মূঢ় বালক, তার গূঢ় কথা জেনে নাও। 'ড়' বলতে গিয়ে ওই বোম ফাটানোর আওয়াজ করবে। তাহলেই 'ঢ়' বেরোবে।"

এসেছে S-এর S-ময়
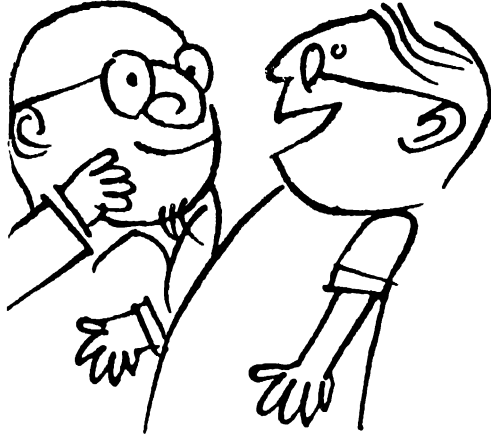
"সামবাজারের সসীবাবু সকালবেলা সাতপয়সার সসা কিনে সাইকেলে চড়ে সোঁ সোঁ করে সসরীরে সর্গে চলে গেলেন—" এই মস্তবড়ো বাক্যটা সব ইংরিজি S-এর মতো 'স' দিয়ে বললেন হিগিনকাকু। ভন্টু আর বাবা হেসে উঠলেন। হিগিনকাকু তাদের পাত্তা না দিয়ে ওই স-স করেই বললেন, "এবার স-এর সময় এসেছে ভাইসব! সব্বাই সান্ত হয়ে সোনো!"

বাবা বললেন, "দোহাই হিগিন, তুই আর বলিস না। আজকাল সক্কলে দেখি স-স করে কথা বলছে। ইশকুল-কলেজে রাস্তাঘাটে যেখানেই ছেলেমেয়েদের কথা শুনি, সবাই এক স—ওই দন্ত্য-স দিয়ে কথা বলছে। অবাক কাণ্ড!"

ভন্টু চেঁচিয়ে বলল, "এ কী বাবা, তুমি আবার ভুল করলে। **ওটা দন্ত্য-স নয়, দন্তমূলীয় স**। তাই না কাকু!"

"যুগ-যুগ জীয়ো, যুগ-যুগ জীয়ো।" বলে ভন্টুকে মুষ্টিবদ্ধ হাতে অভিনন্দন জানালেন হিগিনকাকু। বাবা জিভ কেটে বললেন "হ্যাঁ-হ্যাঁ, দন্তমূলীয় স। কিন্তু হিগিন, তোর কি মনে হয় না যে মেদিনীপুর থেকে দন্তমূলীয় স-এর বাহিনী এসে তালব্য শ-দের দলে দলে আক্রমণ করছে, আর তালব্য শ-রা হেরে ভূত হয়ে দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে? আমার তো মনে হয় বাংলায় তালব্য-শ-দের দিন শেষ হয়ে এল।"

হিগিনকাকু জবাব না দিয়ে আবার আবৃত্তি করলেন, "খুব যে শাইকেলে বসে শিগারেট খাওয়া হচ্ছে! গিয়েছিলে কোথায়? 'শিনেমা দেখতে।' 'কী শিনেমা?' 'শ্যামশন অ্যান্ড ডিলাইলা'।"

বাবা হেসে ফেললেন, "দাঁড়া, দাঁড়া! আমিই বোধ হয় আগে বলেছিলাম আমার এক কলিগের কথা, তাই না? তুইও শুনেছিস নাকি?"

"শুনেছি, হাওড়া-হুগলি-বর্ধমানের বহু অঞ্চলের। কত শ্যাম্পেল চাও। শেমি-ফাইন্যালে রেলওয়ে এফ-শি আজ একটা শেমশাইড গোল খেয়েছে জানো? আমি বাশে করে শাউথের দিকে যাচ্ছিলাম। অ্যাকশিডেন্টা হতে হতে ড্রাইভার শেভ করে দিল, শিট থেকে ছিটকে গেলাম। রেলওয়ে এফ-শির এক শাপোর্টার নাকি শুইশাইড করতে সামনে লাফিয়ে পড়েছিল। টাটা শেন্টারের সামনে তার শুটকেশটা এখনো পড়ে আছে। বড্ড শ্যাড ব্যাপারটা। ক্লাবের শেক্রেটারি আর ভাইশ-প্রেশিডেন্ট লোকটাকে হাসপাতালে নিয়ে গেল।"

"বাপ্ রে বাপ্ রে বাপ্, তুই থাম্ হিগিন। শ-এর জায়গায় স, আর স-এর জায়গায় শ—এ তো মহামুশকিল হল। কী করা যায় বল্ তো!"

ভন্টু বলল, "বাংলা লেখায় তো তিনটে 'শ' আছে কাকু—ওই তালব্য-শ, আর সবাই যাকে বলে দন্ত্য-স, আর মূর্ধন্য-ষ! আমাদের উচ্চারণেও কি তাই আছে? ওই তিনটে শ-ই?"

"উচ্চারণে তো আছে। কিন্তু কে কোতায় কীভাবে আছে সেটা হল গিয়ে কতা, বুইলি বাপ? সেইটে শোন্ তবে," বলে হিগিনকাকু ভুঁড়িতে হাত দিয়ে হঠাৎ থমকে গেলেন। বললেন, "একটু যেন খিদের আওয়াজ পাচ্ছি!"

মূর্ধন্য ষ-র ঠিকানা

পেটভর্তি খাবার-দাবার খেয়ে খিদের আওয়াজকে ঘুম পাড়ালেন হিগিনকাকু, তারপর বললেন, "আমরা যখন কথা বলি, তখন কোথাও মূর্ধন্য ষ-ও দেখা দেয় উচ্চারণে। কিন্তু এটা আমাদের না জানলেও চলবে।"

"না জানলে চলবে মানে?" ভন্টুর বাবা প্রশ্ন উঁচিয়ে ধরলেন।

"চলবে মানে, চলছে। চলছে, চলবে। না, হেঁয়ালি করছি না", বলে একটু খুক-খুক করে হাসলেন হিগিনকাকু, "খুব ইংরিজি ধরনে মাস্টার, মিস্টার, সিস্টার, প্লাস্টার, হস্টেল যখন বলি তখনকার কথা আলাদা, কিন্তু সাধারণভাবে যুক্তব্যঞ্জনে ট ঠ-এর আগে যে 'শ'—সেটা উচ্চারণের দিক থেকেও মূর্ধন্য ষ।"

ভন্টু বলল, "তার মানে কষ্ট, পষ্ট, সুষ্ঠু, অনিষ্ট, চেষ্টা, নিষ্ঠা—এগুলোতে বানানে যেমন, উচ্চারণেও তেমনি, "ওই মূর্ধন্য ষ?"

"হ্যাঁ গো হ্যাঁ, তবে আর বলছি কী? আচ্ছা বাবা ভন্টু, এমন একটা কথা বলো তো যাতে বানানে মূর্ধন্য ষ, কিন্তু উচ্চারণ মূর্ধন্য ষ নয়?"

ভন্টু একটু চোখ কুঁচকে ভাবল। তারপর বলল, "এটা আমি ঠিক শিখিনি, তবে মনে হচ্ছে 'ষাঁড়'-এর 'ষ'-টা হতে পারে।" হিগিনকাকু তাকে দু'হাত জুড়ে নমস্কার করে বললেন, "য়ু আর্-র্-রাইট! 'ষাঁড়'-এর 'ষ' উচ্চারণে তালব্য শ। বাংলাভাষায় যুক্তব্যঞ্জনে ছাড়া আর কিছু বিদেশি শব্দে ছাড়া প্রায় সমস্ত শ-ই তালব্য শ।"

"তাহলে ট-ঠ-র সঙ্গে সে হঠাৎ মূর্ধন্য ষ হতে গেল কেন?" বাবা আবার গোঁ ধরে জিজ্ঞেস করলেন।

"তার কারণ, ট-ঠ হল মূর্ধন্য স্পৃষ্ট ব্যঞ্জন। এ দুটো উচ্চারণের সময় জিভ উলটে গিয়ে যে-জায়গাটায় ঠোক্কর দেয় তার নাম মূর্ধা। ষ্ট ষ্ঠ বলতে গিয়ে জিভ আগে-ভাগে ওই মূর্ধায় পৌঁছে যায় ট ঠ বলবে বলে, কাজেই তখন শ-টাও মূর্ধাতেই উচ্চারিত হয়, তালুতে নয়। কাজেই ওখানে আমরা তালব্য শ পাই না, পাই মূর্ধন্য ষ।"

"হ্যাঁ, বানানে সেটা দেখি বটে।" বাবা এবার প্রশ্নের লাইন ছাড়লেন মনে হল।

হিগিনকাকু হঠাৎ খেপে উঠে বললেন, "আরে বানান নিয়ে ঘ্যানরঘ্যানর করছ কেন? বানানে ষ না থাকলেও হবে। ধরো আঁশটে, দশটা, হাঁসটা, মাসটা, —এগুলোতে যুক্তব্যঞ্জন নেই বানানে, মূর্ধন্য ষও নেই। তবু উচ্চারণে মূর্ধন্য ষ-ই হবে, কারণ শ্-এর পরে ট রয়েছে। এটা হবেই, যাকে বলে অটোমেটিক উচ্চারণ। জিভ ব্যাটার কোনো সাধ্য নেই অন্যরকম করে। এখন বানান ধুয়ে খাও তুমি।"

"আরে চেইত্যা ওঠস ক্যান্?" বাবা শান্ত করার চেষ্টা করলেন পূর্ববঙ্গের ভাষা বলে, "কথাটা এই যে, ওই বিদেশি শব্দগুলো ছাড়া পরে ট-ঠ থাকলে যে-কোনো শ মূর্ধন্য ষ-র মতো উচ্চারিত হবে, এই তো?"

"হ!" হিগিনকাকু রাগ তখনো রয়েছে মনে হল।

কে কতটা বিদেশি

"মূর্ধন্য নিয়ে ভাববার কিস্যু নেই—" হিগিনকাকু আশ্বাস দিলেন, "ও আমরা চাই না-চাই, পরে ট-ঠ থাকলেই বাঙালির শ মূর্ধন্য ষ হয়ে যাবে। কেবল দেখতে হবে শ-স-ষ আর ট-ঠ যেন একদম পাশাপাশি থাকে, মাঝখানে যেন স্বরধ্বনিও না থাকে। যেমন ধরো একষট্টি-তে। এখানে ষ-এর আর ট-এর মাঝখানে 'অ' আছে, যদিও তার উচ্চারণ এখানে ও-এর মতো। ফলে ওই ষ এখানে উচ্চারণে 'শ', মূর্ধন্য ষ নয়। বানান আবার ধুয়ে খাও।"

"কিন্তু মাঝখানে আবার যে ওই হ্রস্ব-ই কার আছে ট-এর আগে?" ভন্টুর বাবা বুদ্ধিমানের মতো জিজ্ঞেস করলেন।

এবার হিগিনকাকু হো-হো, খ্যাক-খ্যাক, খিক-খিক, হ্যা-হ্যা, নানাভাবে হাসলেন কিছুক্ষণ। তারপর দম নিয়ে বললেন, "বড়দা, তুমি কিছুই শেখোনি, দুয়ো-দুয়ো। আরে বানানে হ্রস্ব-ই কার আগে থাকলে কী হবে, ই উচ্চারণ হচ্ছে পরে তো, দ্যাখো রোমান লিপিতে লিখে দেখাচ্ছি choushotti। বাংলায় উচ্চারণ ভেঙে দেখাচ্ছি চ+ওউ্+ষ্+ও+ট্+ট্+ই। বানান তুমি আরেকবার ধুয়ে খাও।"

"ও", বলে ভন্টুর বাবা একটু মিইয়ে গেলেন। ভন্টু কিন্তু উৎসাহিত হয়ে বলল, "এরকম আরও আছে না কাকু বাংলা লেখায়—লিখছি আগে, কিন্তু উচ্চারণ করছি পরে—"

"ইয়েস ফাদার," বলে হিগিনকাকু লিস্টি দিলেন, "এ-কার (ে), ঐ-কার (ৈ)। ও-কার আর ঔ-কার আবার মজা করে দুই পাহারাদারের মতো দুদিক থেকে চেপে রাখে ব্যঞ্জনটাকে, দুভাগে ভাগ হয়ে গিয়ে। উচ্চারণ কিন্তু ওই পরেই হচ্ছে।"

"বুঝেছি বাপু, বুঝেছি রে, আর বলতে হবে না। এমন শ-এর কথায় ফিরে এসো।" বাবা তাড়াতাড়ি বললেন।

"হ্যাঁ, শ। এবার লক্ষ করা যাক কোথায় দন্ত্য, থুড়ি, দন্তমূলীয় স, অর্থাৎ ইংরেজি [S]-এর মতো উচ্চারণ হচ্ছে। এ উচ্চারণ খানিকটা অটোমেটিক, খানিকটা সচেতন। সচেতন উচ্চারণ হয় ধার-করা বিদেশি শব্দে—ধরো বাস, সিনেমা, সেমসাইড, সাইরেন, সিট এইসব ইংরেজি শব্দে। তাই ক্রস 'ক্রশ' নয়, প্র্যাকটিস্ প্র্যাকটিশ্ নয়। কিন্তু ইংরেজি 'পোলিস' (police) 'পুলিশ' হয়ে গেছে। অর্থাৎ এখন এটা দিশি শব্দই। আর যাত্রাটাত্রায় কেউ খুব ফারসি বলার মতো করে ইসলাম, সুলতান, খুবসুরত, সুলেমান, মুসলমান বলে যখন, তখনও এই [S]-এর মতো স আমরা শুনতে পাই। কিন্তু ইংরিজি [S] যেখানে উচ্চারণ করতেই হয়, না করলে স্ট্যান্ডার্ড উচ্চারণ হবে না, উর্দু-ফারসির ওই স-এর সেখানে স্ট্যান্ডার্ড 'শ' উচ্চারণটাই স্বাভাবিক—'ইসলাম' ছাড়া, তাতে [S] চলে। কিন্তু 'শুলতান', 'খুবশুরত', 'শুলেমান', 'মুশলমান' উচ্চারণে অশুদ্ধ নয়। একটি বিদেশি [S] এখনো বিদেশিই হয়ে আছে, আরেকটি বিদেশি [S] অনেকদিন আছে বলে এখন ঘরের লোক হয়ে গেছে খানিকটা। বুয়েচ?"

প্রোশ্‌নো না প্রোস্নো?
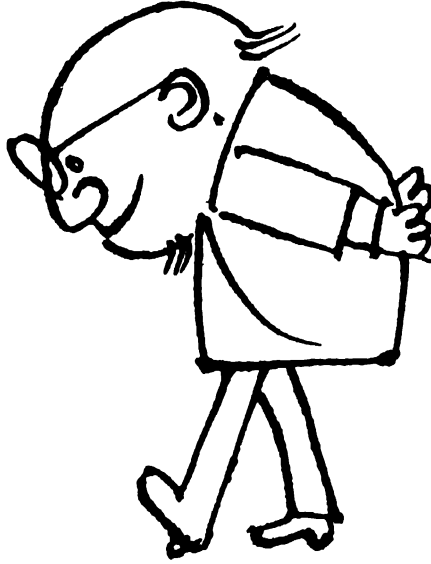
"বিদেশি স্‌ বা [S]-এর কথা তো শুনলে তোমরা, যে 'স্‌' আমরা বিদেশি ভাষা থেকে নতুন ধার করা শব্দে ব্যবহার করি। আমরা মানে যারা মান্য বা স্ট্যান্ডার্ড বাংলা—ওই মান্য চলিত বাংলা বলি। যারা উপভাষা বলে তারা বিদেশি স্‌ বা [S]-কেও যে 'শ' করে ফ্যালে—তা তো তোমরা দেখলে—ওই যে শাইকেল, শিনেমা, বাশ [bus], শিম্পল [Simple] ইত্যাদি।"

."কাকু, এটা বেশ সুন্দর বুঝিয়েছ তুমি", ভন্টু হিগিনকে বাধা দিয়ে বলল, "কিন্তু আমার জানতে ইচ্ছে হচ্ছে, ধার-করা শব্দে নয়, আমাদের বাংলা শব্দে কোনো দন্তমূলীয় স অর্থাৎ S-এর মতো 'স' আছে কি না।"

"আছে বই-কী বাবা আমার—" বলে ভন্টুর থুতনি নেড়ে দিলেন হিগিনকাকু, "তবে আমার মতে সেগুলোও ধার-করা শব্দই। তবে আমাদের নিজেদের দেশের পুরনো ভাষা সংস্কৃত থেকে ধার-করা শব্দ—ওই যাকে তোমরা বেলা 'তৎসম' শব্দ। আর হিন্দি-উর্দু থেকে নেওয়া কটা শব্দ।"

"তা এসব শব্দের সমস্ত স-ই কি ওই দন্তমূলীয় স? [S]-এর মতো?" বাবা জিজ্ঞেস করলেন?

"ধ্যাত, কী যে বল তুমি বড়দা! বাংলায় এসব শব্দের কেবল বিশেষ বিশেষ জায়গায় S-এর মতো স পাই।"

"কোথায় কোথায় কাকু?"

"কেবল যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণে। আর কোথাও নয়। অন্য জায়গায় শ, স, ষ যে অক্ষরই থাক, অযুক্ত হলে তার উচ্চারণ সব সময় 'শ'-এর মতো।"

"তা তৎসম আর হিন্দি-উর্দু থেকে ধার-করা শব্দের যুক্তব্যঞ্জনে কোথায় কোথায় 'S' উচ্চারণ হয়?"

হিগিনকাকু এবার অস্থিরভাবে উঠে দাঁড়িয়ে পায়চারি করতে লাগলেন। ভন্টুকে বললেন, "খাতা খোলো, লিখে নাও। এক নম্বর, যে যুক্তব্যঞ্জনে দ্বিতীয় বর্ণ ত, থ, ন, র, ল—তার প্রথম বর্ণ স হোক শ হোক—তার উচ্চারণ হবে [S]-এর মতন। উদাহরণ স্তব, আস্ত, রাস্তা, দস্তখত, মস্তক, মস্ত, বস্তু; স্থল, স্থান, স্থিতি, স্থির, অবস্থা, সুস্থ, আস্থা; স্নান, জ্যোৎস্না, প্রশ্ন, প্রস্রবণ, পরিস্রুত, সৃষ্টি, আশ্রয়, বিশ্রাম, শ্রবণ, শ্রাবণ, শ্রী, বিশ্রী, শ্রুত, শ্রেয় ; শ্লীল, অশ্লীল। লক্ষ করো, আমি ত-থ-ন-র-ল ধরে ধরে যুক্তব্যঞ্জন সাজিয়েছি। 'ঔ-খে ডোখ্'?" (O. K. Doke!) মার্কিনি বুলি দিয়ে শেষ করলেন হিগিনকাকু।

বাবা হাত তুলে বললেন, "সব ঠিক আছে গুরু, কেবল 'প্রশ্ন' নিয়ে প্রশ্ন আছে। তুমি বললে ওটা S-এর মতো স। কিন্তু আমরা তো সে-রকম উচ্চারণ করি না। আমরা তো শ্-ই বলি—প্রোশ্নো। তাই না?"

"বিলকুল সচ্ বাত! কিন্তু আমরা লেখাপড়া-জানা লোকেরা ওটার বানান দেখে 'শুদ্ধু' উচ্চারণ করি। এর নাম Spelling Pronunciation। আমাদের বিদ্যের অহংকার আছে তো? এ-জন্য ভাষার যা স্বাভাবিক উচ্চারণ, তা না করে ভাবি, বানানে তালব্য শ, তবে স্ বলব কেন? তাই অনেকে অশ্লীলও বলে শোনোনি?"

"তা আমরা কোন্টা বলব?"

'প্রোশ্নো' চলে গেছে, শ্লীল-অশ্লীল চলবে না স্লিল-অস্স্লিল বেঁচে থাক!" বলে হিগিনকাকু ঘড়ি দেখে বিরাট এক লাফ মেরে চলে গেলেন।

স-এর ভণ্ডামি

পরদিন হিগিনকাকু এসেই সোজাসুজি ওই স-কে আক্রমণ করলেন। একটু 'হ্যাহ্যাহ্' করে গলা ঝেড়ে বললেন, "তাহলে শ-স-ষ-এর মধ্যে স বা [S]-এর দেখাসাক্ষাতের বিষয়টা—।" তখনও পুরোপুরি ঘরে ঢোকেননি, চৌকাঠের এদিকে একটা পা, কথাগুলো ওখান থেকেই ছুঁড়ে দিলেন। বাবার কাগজ পড়া বন্ধ হল, ভন্টু ব্রেকফাস্টের টেবিল থেকে টোস্টসুদ্ধ প্লেট তুলে নিয়ে বসবার ঘরে চলে এল। হিগিনকাকু বললেন, "যুক্তব্যঞ্জনে স বা শ-এর সঙ্গে ত, থ, ন, র, ল থাকলে সব জায়গায় S-এর মতো স—এই হল নিয়ম। দিশি স-এর এক নম্বর নিয়ম।"

ভন্টু এর মধ্যে বুঝে গেছে নিয়ম থাকলে ভাষায় তার ব্যতিক্রমও থাকতে পারে, তাই জিজ্ঞেস করল, "এর কোনো ব্যতিক্রম নেই?"

"ব্যতিক্রম ঠিক নেই। তবে মূর্ধন্য-ষ মূর্ধন্য-ণ-এ যে যুক্তব্যঞ্জন—ষ্ণ সেখানে মূর্ধন্য-ষ-এর উচ্চারণ শ্, দন্তমূলীয় স নয়। উষ্ণ-কে 'উsনো' বললে ভুল হবে। উশ্নো-ই হবে।"

ভন্টু বলল, "কিন্তু আমাদের পাড়ায় যে বৈরিগিঠাকুর আসে একজন, সে খঞ্জনি বাজিয়ে 'রাধেকিsনো' বলে গান গায়—"

হিগিনকাকু ভন্টুকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "তার নামকীর্তনে ভুল হয় গোপাল আমার।"

বাবা অধৈর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "ঠিক আছে বাবা, তা না হয় হল। কিন্তু যুক্তব্যঞ্জনে আর কোথায় স বা [s] পাই?"

"পাবে বড়দা, পাবে।" হিগিনকাকু চোখ টিপলেন। "শব্দের গোড়ায় দন্ত্য-স-র সঙ্গে ক, খ, প, ফ—যারই যুক্তব্যঞ্জন থাক—ও স্-এর উচ্চারণ হবে দন্তমূলীয়, ওই [s]-এর মতো। যেমন স্কন্দ, স্কন্ধ, স্খলন, স্পন্দন, স্পর্ধা, স্ফুরণ, স্ফূর্তি। এই হল দু-নম্বর নিয়ম।"

"ঠিক তো!" মনে মনে শব্দগুলো আউড়ে গেল বাবা ভন্টু দুজনেই। "কিন্তু শব্দের গোড়ায় বলছ কেন?"

"বলছি কি সাধে? স এখানে একটা বিশ্রী ভণ্ডামি করছে। শব্দের গোড়ায় সে দিব্যি স্-স্ করছে, কিন্তু যখনই শব্দের গোড়া থেকে সে মাঝখানে যাচ্ছে, তখনই সে উচ্চারণে শ্ হয়ে যাচ্ছে। শব্দের গোড়ায় তার এক চেহারা, শব্দের মাঝখানে অন্য। ধরো এই স্ক-এর স্। 'স্কন্ধ'-তে তার উচ্চারণ [S] কিন্তু তস্কর-এ শ্, ভাষাবিজ্ঞানে যার নাম 'এশ্'। 'স্পর্ধা'-তে [S], আস্পর্ধাতে শ্ ; এমনি করে 'স্খলন'-এ [S], কিন্তু 'পদস্খলন'লএ শ, 'স্ফোটক'-এ [S]—কিন্তু 'বিস্ফোটক'-এ শ্। এমন-কী 'স্মিত'-তে [S], কিন্তু 'বিস্মিত' [বিশ্শিঁতো]-তে শ্। 'শুচিস্মিতা' তাই 'শুচিশ্মিতা'। তবে পুরনো স্ট্যান্ডার্ড উচ্চারণে শব্দের গোড়াকার 'স্ম' 'শঁ' হয়, যেমন স্মরণ—শঁরোন, স্মিত—শিঁতো, এমন-কী 'শুচিশ্শিতা' (শুচিস্মিতা)। তা সে ম-ফলা উচ্চারণ না করলে শ্ হবেই। কারণ বিদেশি শব্দ ছাড়া দেশি শব্দে একা যে স্, তা সব সময় শ্। স্মরণ-এ গোড়াকার স্ উচ্চারণে একা, কাজেই উচ্চারণে সে শ্। ম সেখানে উধাও। কিন্তু শব্দের গোড়ায় আর মাঝখানে স্-এর ব্যাভারখানা দেখলে তো? দুমুখো স্-স্-সাপ আর কাকে বলে? কিন্তু মনে রেখো, ত, থ, ন, র, ল-এর সঙ্গে যুক্ত স/শ খুব লক্ষ্মী ছেলে। Cs s-অব Gোময় স্যামবাজারের স।"

বাবাও ঘাবড়ে গিয়ে বললেন, "Cোত্তি sাঙ্ঘাতিক s-অভাব এই s-অ-এর!"

বাংলা শ-র রাজ্যপাট

"এইবার এক গামলা কালো কফি, পঁচিশটা ফুলকপির বড়া, খান-সাতষট্টি নলেনগুড়ের সন্দেশ নিয়ে এসো—" স-এর পালা শেষ করে হিগিনকাকু হুংকার দিলেন, "রান্নাঘরমে কোই হ্যয়!" বলে সোফায় এলিয়ে পড়ে চোখ বুজে ফেললেন। ভন্টু ভাবল এবার বুঝি কাকু একটু নাক ডাকিয়ে নেবেন। কিন্তু ঠিক সতেরো সেকেন্ড থেকে চোখ বোজা অবস্থাতেই জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে জনগণ, ইংরিজি s-এর মতো স্ কোথায় কোথায় পাই আমরা বাংলায়, আরেকবার হয়ে যাক বাবা।"

ভন্টু বুঝল, প্রশ্নটা তাকেই করা হচ্ছে। সে খাতায় টুকে রেখেছিল একটু-আধটু, তা খুলে বলতে লাগল, "এক নম্বর, বিদেশি শব্দের সঙ্গে যে s-জাতীয় ধ্বনি আছে, সেগুলো বাংলায় এসে স্ট্যান্ডার্ড উচ্চারণে মোটামুটি s-ই থেকে যায়..."

"গুড! অতঃপর?"

"দু নম্বর, ত্ থ্ ন্ র্ ল্-এর আগে যুক্তব্যঞ্জনে যে-শ-ই যুক্ত হোক না কেন, সর্বত্র তার উচ্চারণ (s) বা স্।"

"হ্যাঁ, 'প্রশ্ন' কথাটার উচ্চারণ প্রোস্নো হওয়া উচিত ছিল, অনেকে বলেও, কিন্তু প্রোশ্নো আজকাল বেশি মার্জিত শোনায়।"

"ইনক্রেডিব্‌ল! তিন নম্বর?"

"তিন হল, শব্দের গোড়ায় দন্ত্য-স-এর সঙ্গে ক, খ, প্‌, ফ্‌-এর যুক্তব্যঞ্জন থাকলে সে দন্ত্য-স-এর উচ্চারণ ওই দন্তমূলীয়, s-এর মতো; কিন্তু ওই একই যুক্তব্যঞ্জন যদি শব্দের মাঝখানে থাকে তাহলে স্‌-এর উচ্চারণ হবে শ্‌-এর মতো।"

"বিউটিফুল! আর স্ম-এর কেস্‌টা?"

এবার বাবা মুখ খুললেন। বললেন, "তোর কথা থেকে যা বুঝলাম, পশ্চিমবাংলার পুরনো স্ট্যান্ডার্ড উচ্চারণে স্ম 'শঁ'-এর মতো উচ্চারণ হত—স্মিত=শিঁতো, এমন-কী শুচিস্মিতা=শুচিশ্‌শিঁতা। কিন্তু আজকাল আমরা অনেকে ম রেখে উচ্চারণ করছি। তখন শব্দের গোড়ায় স্ম-এর স s-এর মতো হচ্ছে, মাঝখানে তা শ্‌। আমার প্রশ্ন এই নতুন ধরনের উচ্চারণ কেন করছি আমরা?"

"চমৎকার প্রশ্ন করেছ ভাই বড়দা। আমরা বানান ধরে উচ্চারণ অর্থাৎ স্পেলিং প্রনান্‌সিয়েশন করছি বলেই এই নতুন উচ্চারণ জেগে উঠছে। এবার বলো বাংলা উচ্চারণে মূর্ধন্য-ষ্‌ কোথায় পাই?"

ভন্টু বলল, "কেবল ট-ঠ-এর আগে।"

"শাবাশ বীর গাজী পীর!" বলে উচ্ছ্বাস করে উঠলেন হিগিনকাকু। তখনও চোখ বুজে।

ভন্টু বলল, "কিন্তু কাকু, জানা হল না যে শ্‌ কোথায় কোথায় আছে!"

"সব জায়গায় আছে বাপ্‌, সব জায়গায়। অযুক্ত ব্যঞ্জনে আর কিছু বিদেশি শব্দে ছাড়া আর সব স-ই শ্‌। 'ষণ্ডটি ফোঁস ফোঁস করে শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে সারমেয়টিকে শাসন করতে ছুটে 'গেল'—এই কথাটার সবগুলো স-ই, শ-ষ-স সব—তালব্য শ। বাংলা উচ্চারণে তালব্য-শ'টি জলে স্থলে অন্তরিক্ষে সর্বত্র আছেন।" বলে চোখ খুলে বললেন, "কই রে, কফি এল? এবং তার সাঙ্গোপাঙ্গ?"

'শ' বলার কায়দা
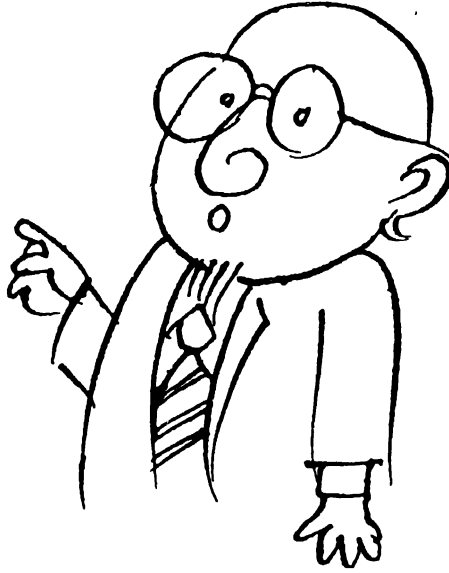
"জান কাকু," ভন্টু বলল, "এই সব শ-ষ-স-এর কথায় আমাদের ক্লাসের নিরঞ্জন ভৌমিকের কথা মনে পড়ছে। ও আর কোনো শ বলতে পারে না, শুধু ওই 'সামবাজারের সসিবাবু'র মতো করে 'স' বলে। এই নিয়ে অন্য ছেলেরা তো ওকে খ্যাপায়ই, মাস্টারমশাইরাও ওকে বকেন। বাংলার স্যার তো ক্লাসে এসেই ওকে ঠাট্টা করে ডাকেন, 'এই যে বঙ্গাভাসার সুসন্তান, বাবা নিরঞ্জন, একবার সুস্বরে স বলো তো, সব সন্দেহ ভঞ্জন হোক, সুনে সান্তি পাই'—সব ওই স-স ক'রে। সক্কলে হাসে, আমার কিন্তু খুব খারাপ লাগে। বেচারার মুখটা কেমন হয়ে যায়।"

"হুঁ, ভাষা নিয়ে ঠাট্টা করা খুব খারাপ।" হিগিনকাকু গম্ভীর মুখে বললেন। "খুব অন্যায়। আর তা ছাড়া তোর স্যারের ভাষায় দোষ যে নেই তাই বা কে বললে? আমি থাকলে ঠিক বার করে ফেলতাম।"

"আছে তো! উনি নিজে তো 'শুনিচি', 'বলিচি', 'করিচি' বলেন। ওগুলো কি ঠিক?"

"কক্ষনো না! ওগুলো স্ট্যান্ডার্ড ভাষা নয়। কিন্তু সে যাই হোক, তোমার ওই বন্ধুটিকে সাহায্য করার কথা কিছু ভেবেছ?"

"সাহায্য, মানে?" ভন্টু অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করল।

"মানে তাকে 'শ' বলা শিখিয়ে দিতে পার তুমি।" হিগিনকাকু একটু গর্ব-গর্ব ভাব আনলেন গলায়।

"ও বাব্বা, শ-এর উচ্চারণ শেখানো যায় নাকি?" ভন্টু হাততালি দিয়ে বলল, "এক্ষুনি বলে দাও তবে!"

"শোনো, সামবাজারের স, যাকে আমরা দন্তমূলীয় স বলছি, সেটা বলার সময় জিভ কোথায় ছুঁচ্ছে দ্যাখো। লক্ষ করেছ?"

"হ্যাঁ—" স্-স্ একটু বলে নিয়ে ভন্টু উত্তর দিল, "ছুঁচ্ছে ওই ওপরপাটির দাঁতের পেছনের ঢিবিতে, অর্থাৎ দন্তমূলে।"

"চমৎকার!" হিগিনকাকু অর্কেস্ট্রা চালানোর মতো করে হাত নাড়তে-নাড়তে বললেন, "আবার বলো স্-স্-স্-স্! জিভ ওখানেই রাখো।"

ভন্টু ইংরিজি [s-s-s]-এর মতো আওয়াজ টেনে যেতে লাগল।

"এইবার!" হুংকার দিয়ে উঠলেন হিগিনকাকু, "জিভটা মুখের ছাদের সঙ্গে লাগিয়ে রেখে একটু পিছিয়ে নাও, তালুর ওই গর্তমতন জায়গাটায় আনো।"

তা করতেই স্-স্-স্ হঠাৎ শ্-শ্-শ্-এ বদলে গেল, ভন্টু প্রায় লাফিয়ে উঠল। হিগিনকাকু ভারিক্কি চালে বললেন, "নিরঞ্জনকে কায়দাটা শিখিয়ে দেবে, আর বলবে শ বলতে হলে জিভটা ওই পেছনে ঠেকাতে হবে। প্র্যাকটিস করলে দুদিনেই শ বলা শিখে নেবে সে। স দিয়ে শুরু, জিভ পেছনে টেনে নিলেই শ-এর সাক্ষাৎ!

আবার যারা স বলতে পারে না, তারা যেন প্রথমে শ্-এর জায়গায় জিভ লাগিয়ে শ্ বলে, তারপর জিভটা ঠেলে এগিয়ে আনে। দাঁতের গোড়ায় জিভটা এলেই তা 'স' হয়ে যাবে। বোয়েসেন? তবে প্র্যাকটিসের জন্যে তাকে পাশাপাশি এই ক-টা শব্দ উপহার দিচ্ছি—"

বাংলা শব্দ	ইংরেজি শব্দ
বাস (ভূমি)	bus
শীত	Seat
শ্যাম	Sam
সরি	Sorry
সার	Sir
সরকার	circus
সৈন্য	Cynus

তবে মনে রেখো, ইংরেজি Sure কিন্তু 'শ্যোর্', সামবাজারের স দিয়ে নয়। Sugar-ও 'শুগার্', সুগার নয়।"

হারানো হ-এর হদিস

"হ-এর গণ্ডগোলই কি কম?" হিগিনকাকু বিষণ্ণভাবে বলে সোফায় হেলান দিলেন।

"সে কী রে, হ আবার কী দোষ করল?" ভন্টুর বাবা বললেন ঢুকতে-ঢুকতে, "হ নিয়ে কোনো সমস্যা আছে বলে তো শুনিনি।"

"হ নিয়ে সমস্যা হল হারানো-প্রাপ্তি-নিরুদ্দেশ!" হিগিনকাকু ডানহাতের তর্জনী তুলে বললেন, "সে প্রায়ই ডুব দেয়।"

" সে তো আমাদের বাঙালদের কথায় হয়। শব্দের গোড়ায় হ থাকলে সে নিখোঁজ হয়ে যায়। সেই যে—পরশুরাম লিখেছিলেন 'অয়, অয়, Zানতি পার না!" 'হয়েছে' না বলে আমরা বলি 'অইসে', 'হিন্দু' না বলে 'ইন্দু'। 'হাতি' না বলি 'আত্তি'। একটা যাত্রা দেখেছিলাম, তাতে একজন 'আজারে আজারে ইন্দু সেনার অইত্যা'র কথা বলছিল।"

ভন্টু বলল, "কিন্তু কাকু, ঠামাদের কথাতে স-এর জায়গায় একটা হ বলে শুনেছি তো। 'সকল' হবে, বলে 'হগল'। কেমন মজা, না! হ এক জায়গা থেকে উধাও হয়ে আরেক জায়গায় গিয়ে বসছে।"

বাবা বললেন, "এ নিয়ে একটা ঠাট্টা শুনেছিস? এক পশ্চিমবঙ্গের লোক ঢাকার লোককে বলছে, 'মশাই, আপনারা কথায় কথায় স-এর জায়গায় হ বলেন কেন বলুন তো?' ঢাকার লোকটি চটে উঠে বললেন, 'এইটা হাসা কথা না, এক্কেরে ব্যাবাক্ মিথ্যা, আমাগো হত্রুপক্ষের রটনা।' পশ্চিমবঙ্গীয় মুচকি হেসে বললেন, 'এই তো বললেন দু-দুবার—সাচা-র জায়গায় হাচা আর শত্রুর জায়গায়

হত্র!' ঢাকার লোকটি বিরক্তভাবে বললেন, 'কী হুনতে কী হোনেন আপনেরা তার ঠিক নাই। হক্কল হ-ই হ-স্থানে আজির আসে।'

"আরে থামো থামো," হিগিনকাকু বাধা দিলেন, "ঢাকার হ-দের নিয়ে আমি মাথা ঘামাচ্ছি না। তারা যেখানে খুশি যাক। সেখানে স-রা যদি হ হতে চায় হোকগে। ওটা সম্ভবত অসমিয়া ভাষার প্রভাব। সেখানেও স-হ-এর মতো একটা জিনিস হয়। যেমন অসম সাহিত্য সভার সভাপতি সত্যেন্দ্রনাথ শর্মা নাকি হয় 'অহম হাহিত্য হভার হভাপতি হত্যেন্দ্রনাথ হর্মা।' অন্তত অসমিয়া বন্ধুদেরই এ নিয়ে ঠাট্টা করতে শুনেছি। কিন্তু আমার ভাবনা মান্য চলিত বাংলার হ-দের নিয়ে। তারা যে হঠাৎ হঠাৎ উধাও হয় শোনোনি? 'মহারাজ' হয় 'মআরাজ', 'ব্যাহত' 'আহত' হয় 'ব্যাওতো' 'আওতো', 'সহজ' হয় 'সওজ', 'মহৎ' হয় 'মওৎ'?"

"ঠিক বলেছিস তো!" বাবা বললেন, "প্রচুর লোকের মুখে শুনি এ-রকম। এটা কেন হয় রে?"

"দুটো স্বরধ্বনির মধ্যে থাকলে 'হ' কেটে পড়তে চায়। শুধু বাংলায় কেন, ইংরেজি, স্প্যানিশ—অনেক ভাষায় এ-রকম ঘটে। জান না, forehead কথাটার হ খ'সে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল 'ফোরিড'? পরে লেখার সঙ্গে মিলিয়ে বলতে গিয়ে হ উদ্ধার হয়, এখন তার উচ্চারণ ফো (র্) হেড।"

"তা এই হ-কে ধরে রাখার উপায়?" ভন্টু জিজ্ঞেস করল।

"একমাত্র উপায় খেয়াল করে ধরে রেখে হ-কে উচ্চারণ করা। তাকে ফসকে পালাতে না দেওয়া। তার ল্যাজ ধরে টেনে রেখে দেওয়া। আর তো কোনো উপায় দেখি না। হ হারালেই হাহাকার করতে হবে। নয়তো হুহুংকার শুনবে, বুঝেছ?"

বিন্দু-বিসর্গ

"অনুস্বার আর ঙ-র মধ্যে আমাদের উচ্চারণের কোনো তফাত নেই, বুয়েচ বাবা ভন্টু," হিগিনকাকু বললেন, 'ঙ-র হসন্ত উচ্চারণই অনুস্বারের উচ্চারণ।"

"ও মা, তাহলে অনুস্বারটা আছে কেন আমাদের বর্ণমালায়?" ভন্টু জিজ্ঞেস করল।

"আরে এ সেই তো ঠাকুরদাদার ওভারকোট—আমরাও ব্যবহার করে চলেছি। সংস্কৃতের বর্ণমালা—আমরা সেটাকেই বাংলা চেহারা দিয়ে হুবহু ধরে রেখেছি। সংস্কৃতের অনুস্বারের যা উচ্চারণ ছিল বাংলায় সেটা নেই, এখন ঙ-এর সঙ্গে তার উচ্চারণের কোনো তফাত নেই। তবে ব্যবহারের তফাত আছে। ঙ শব্দের মাঝখানেও বসতে পারে, তার সঙ্গে আ-কার ই-কার সব লাগানো চলে। কিন্তু ং-এর সঙ্গে সে-সব কিছুই লাগে না। দুটোর কোনোটাই কিন্তু শব্দের গোড়ায় বসে না। ঠিক তো?"

ভন্টু অনেক ভেবেও যখন ঙ বা ং দিয়ে শুরু এমন কোনো শব্দ বার করতে পারল না, তখন গম্ভীরভাবে মাথা নাড়ল। ভাবল পরদিন স্কুলে গিয়ে ক্লাসের বন্ধুদের বাধায় ফেলবে, "ঙ বা ং দিয়ে আরম্ভ এমন একটা বাংলা কথা বার

কর দিকিনি” বলে।

“আর বিসর্গ?” ভন্টুর বাবা জিজ্ঞেস করলেন।

“বিসর্গ যখন আবেগ উচ্ছ্বাসের শব্দের শেষে, তখন তার উচ্চারণ হবে হ-এ হসন্তের মতো—‘উঃ’, ‘অ্যাঃ’, ‘যাঃ’– এইসব। সংস্কৃত মন্ত্র পড়তে হলে অনেকে পুরো ‘হ’ বলে ফ্যালে বিসর্গর জায়গায়—সেটা ঠিক নয়। ‘নমঃ’ হবে ‘নমহ্’, ‘নমহঅ’ (ন্+অ+ম্+অ+হ্+অ) নয়। কিন্তু শব্দের মাঝখানে যে বিসর্গ, তার বড়ো দুঃখ। সে বেচারা হ-ট কিছুই নয়, সে পরের ব্যঞ্জনটাকে প্রায়ই দুনো করে দেয়। ফলে ‘দুঃখ’ হল ‘দুক্খো’, ‘নিঃস্ব’ হল ‘নিশ্শো’, ‘নিঃশ্বাস’ হল ‘নিশ্শাশ্’, ‘অতঃপর’ হল ‘অতোপ্পর’।

তবে ভাইসব, পুরানো ধরনের বানানে আরো একটা বিসর্গ পাই আমরা, ত-এর সঙ্গে জুড়ে থাকা—যেমন অন্ততঃ, বস্তুতঃ, কার্যতঃ, ফলতঃ—ইত্যাদিতে, বা শ-এর গায়ে লাগানো, যেমন ক্রমশঃ, প্রায়শঃ। সেখানে তার উচ্চারণই নেই। এজন্যে আজকাল এসব বানানে বিসর্গ লেখাই হয় না।

ভন্টু রসিকতা সামলাতে পারল না, বলল, “এসব বানানে বিসর্গের স্বর্গপ্রাপ্তি ঘটেছে, বলো কাকু।”

যুক্তব্যঞ্জনের গণ্ডগোল
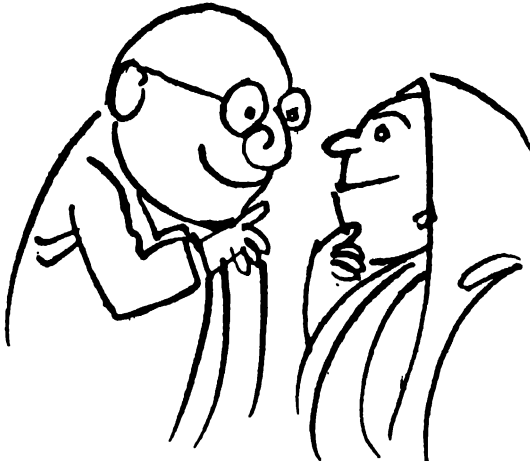
পরদিন দেখা গেল হিগিনকাকু এসেই ভন্টুর মাকে খুব খটোমটো বাংলায় বলতে লাগলেন, "এই যে ভদ্রে ভ্রাতৃবধূঠাকুরানি, কয়েক পাত্র কৃষ্ণকায় কফি হবে তো? দুগ্ধহীন, শর্কবাবর্জিত কফি? অধিকন্তু—" কিন্তু কথা শেষ করার আগেই ভন্টুর মা বলে উঠলেন, "ওরে বাপ রে বাপ রে বাপ, বন্ধ করো ঠাকুরপো, বন্ধ করো। আমি সমোস্কৃত একদম বুঝি না। না কি আজকাল তুমি যাত্রার পার্ট ধরেছ?"

হিগিনকাকু মনমরা হয়ে বললেন, "বলছি খাঁটি বঙ্গভাষা, বলে কিনা 'সমোস্কৃত'! আর কথাটা 'সমোস্কৃত' নয় 'সঙ্‌স্কৃত'। যাই হোক, কেন এ ভাষা বলছি জান? আজ থেকে আমরা যুক্তব্যঞ্জনের আলোচনা শুরু করব।"

ততক্ষণে বসবার ঘরে সবাই আসর জমিয়ে বসেছেন। রান্নাঘরে কেটলির জলের শোঁ-শোঁ আওয়াজ উঠেছে, কাল এনে রাখা প্যাটিজও বোধহয় গরম করা হচ্ছে—তার মধ্যে ভন্টুর বাবা জিজ্ঞেস করলেন, "যুক্তব্যঞ্জন দিয়ে আবার কী হবে? তার উচ্চারণে আবার কোনো সমস্যা আছে নাকি? পর-পর দুটো ব্যঞ্জন উচ্চারণ হলেই তো যুক্তব্যঞ্জন, তাই না?"

"আরে দাদা, অত সোজা নাকি জিনিসটা? প্রচুর সমস্যা আছে। কিন্তু আগে দুটো জিনিস আলাদা করে খেয়াল করো। লেখার যুক্তাক্ষর বা যুক্তব্যঞ্জন একদিকে, আর কথার পরপর বা পাশাপাশি ব্যঞ্জন আর-একদিকে। যেমন ধরো 'আস্ত' কথাটার 'স্ত' যুক্তাক্ষর বা যুক্তব্যঞ্জন, কিন্তু 'আসত' কথাটার 'সত' পাশাপাশি ব্যঞ্জন

মাত্র। অথচ ইস্কুলে বর্ণভাগ করতে দিলে দুটোই হবে (আ+স্+ত্+ও)। তাই তো?"

ভন্টু শেষে 'অ' না হয়ে কেন 'ও' হচ্ছে বুঝে নিয়ে, মাথা ঝাঁকাল। বাবা বললেন, "ঠিক আছে, কিন্তু তাতে কী হল?"

হিগিনকাকু গলা চড়িয়ে বললেন, "আমি বলতে চাই, 'পাশাপাশি' ব্যঞ্জনের দুটোই পরপর পরিষ্কার উচ্চারণ হয়, কিন্তু লেখার যুক্তব্যঞ্জনের দুটোই সবসময় উচ্চারণ নাও হতে পারে। যেমন 'কদমা'-তে 'দ্' 'ম' দুটোই শুনি আমরা, কিন্তু 'পদ্ম'-তে? সেটা তো আমাদের মুখে 'পদ্দো'। তার ম-খানা গেল কই?"

বাবা ভন্টু দুজনের হাতই মাথায় উঠল। চুলকোবার জন্যে।

ত্রি-ফলার বিবরণ

হিগিনকাকু বলতে লাগলেন, "কাজেই লেখার যে যুক্তাক্ষর, তার উচ্চারণের নানা ঝামেলা রয়েছে। এই ধরো ত্রি-ফলা, মানে য-ফলা, ব-ফলা আর ম-ফলা।"

ভন্টু হঠাৎ বলে বসল, "কাকু, কথার মাঝখানে কথা বলছি বলে কিছু মনে কোরো না। বাবা যে বলছিল পর পর দুটো ব্যঞ্জন মিলে যুক্তব্যঞ্জন—কথাটা কি ঠিক? কারণ এক্ষুনি আমার মনে পড়ল, 'স্ত্রী'-তে যে 'স্ত্র' আছে, তাতে তিনটে ব্যঞ্জন পরপর—'স', 'ত' আর 'র্'।"

"সুপিরিয়র কিড্!" বলে ভন্টুর পিঠ চাপড়ে দিলেন হিগিনকাকু। "বালক, তুমি অভ্রান্ত কথা বলেছ। বাংলায় দু-বর্ণের যুক্তাক্ষর প্রচুর আছে, বেশ কিছু তিন-বর্ণের যুক্তাক্ষরও আছে। কিন্তু আমরা দু-বর্ণের যুক্তাক্ষরগুলোর কথা আগে সেরে নিই, কেমন?" বলে বলতে আরম্ভ করলেন, "যে যুক্তাক্ষরগুলো একই বর্ণের দুটো মিশে তৈরি হয়েছে, সেগুলো নিয়ে কোনো বিপদ নেই। যেমন ক্ক, চ্চ, ট্ট, ত্ত, ব্ব, ম্ম, ল্ল ইত্যাদি। একবারে দুটো উচ্চারণ করে গেলেই হল। কিন্তু ধরো ক্য, চ্য, ত্ব, শ্ব, দ্ম, স্ম? ওই য-ফলা, ব-ফলা, ম-ফলা? তার মানে আমরা ধরে নিচ্ছি প্রথম ব্যঞ্জনটার সঙ্গে সঙ্গে য বা ব বা ম জুড়ে যাচ্ছে। কিন্তু ওই য বা ব বা ম কি উচ্চারণ করি আমরা? নাইন! নাইন!" জার্মানভাষায় 'না, না'

বলে শেষ করলেন হিগিনকাকু।

"তবে কী করি?" ভন্টুর বাবার দিক থেকে প্রশ্ন এল।

"সাধারণভাবে য-ফলা, ব-ফলা বা ম-ফলা থাকলে দুটো জিনিস করি। এক, শব্দের গোড়ায় যদি এই ফলাওয়ালা যুক্তাক্ষর থাকে, তাহলে শুধু প্রথম ব্যঞ্জনবর্ণটারই উচ্চারণ করি, ফলার উচ্চারণকে গুলি মেরে দিই। যেমন য-ফলা শব্দের প্রথম অক্ষরে 'অ্যা' হয়ে যায়—ব্যয় ব্যক্ত ব্যবহার : ব-ফলার কিছুই থাকে না—শ্বাস [শাশ্], ত্বক [তক্], ক্বাথ [কাথ্], স্বপ্ন [শপ্নো]; আর ম-ফলাও নাকি-কান্না কেঁদে বিদায় নেয়—স্মরণ [শঁরোন্], স্মিত [শিঁতো]। আর শব্দের গোড়ায় যদি না থাকে—"

এমন সময় ওই কৃষ্ণকায় কফি এবং বুচিকর প্যাটিজ এসে হিগিনকাকুর মুখ বন্ধ করল।

য-ফলার আচরণ

কফি-টফি খাওয়া শেষ হলে ভন্টু বলল, "কাকু, তুমি বলছিলে যে য-ফলা, ব-ফলা, ম-ফলা—এগুলো শব্দের গোড়ায় থাকলে—"

হিগিনকাকু তার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বললেন, "শুধু ব্যঞ্জনটারই উচ্চারণ হয়, ফলাটার হয় না। যেমন ধরো, য-ফলা। ব্যয় [ব্যায়], ব্যাখ্যা [ব্যাক্‌খা], খ্যাত [খ্যাতো],—এই সবগুলোতে গোড়ায় শুধু 'ব' বা 'খ' শুনছি আমরা। য-ফলাটা 'অ্যা' হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু য-ফলা-লাগানো ব্যঞ্জন শব্দের মাঝখানে থাকলেই তা ডবল হয়ে যাচ্ছে। যেমন, 'অখ্যাত' হচ্ছে 'অক্-খ্যাতো'। ব-ফলা, ম-ফলার বেলাতেও একই নিয়ম। 'শ্বাস' বলতে বলি 'শাশ্‌' কিন্তু 'বিশ্বাস' উচ্চারণ 'বিশ্‌-শাশ্‌'। 'স্মরণ' উচ্চারণে 'শঁরোন', কিন্তু 'বিস্মরণ' হল 'বিশ্‌-শঁরোন'। আর শুধু এই 'ত্রিফলা' কেন, 'ক্ষ' 'জ্ঞ'-এর ব্যবহারও অবিকল এক। 'ক্ষয়' বলছি 'খয়', কিন্তু 'অক্ষয়' উচ্চারণ করছি 'অক্-খয়', 'জ্ঞান' হল 'গ্যাঁন', কিন্তু 'বিজ্ঞান' উচ্চারণে 'বিগ্‌গ্যাঁন' বা 'বিগ্‌-গ্যাঁন'। হল তো?"

ভন্টু মাথা ঝাঁকিয়ে বলল বুঝেছে।

"তো এই হল গিয়ে ব্যাপার। য-ফলার সংস্কৃতে উচ্চারণ ছিল 'ইয়' গোছের—অন্তঃস্থ য-রই ছিল ওই উচ্চারণ। বাংলায় আলাদা অন্তঃস্থ য-কে আমরা 'জ' উচ্চারণ করি। কিন্তু য-ফলা শব্দের গোড়ার 'অ্যা', আর গোড়ায় না থাকলে আগের ব্যঞ্জনকে ডবল করে নেয় প্রথমে। তারপর সঙ্গে কিছু না থাকলে হয় 'অ' বা 'ও', অ-কার থাকলে হয় 'আ', হ্রস্ব-ই দীর্ঘ-ঈকার থাকলে হয় 'ই'। যেমন, খাতায় লিখে দ্যাখো—"

ভন্টু খাতা খুলে শুনে লিখল

শব্দের গোড়ায়	**অন্যত্র**
ব্যয় [ব্যায়]	অব্যয় [অব্‌-বয়্‌]
	কাব্য [কাব্‌-বো]
ব্যাহত [ব্যাহতো]	অব্যাহত [অব্‌-ব্যাহতো]
ন্যস্ত [ন্যাস্তো]	বিন্যস্ত [বিন্‌-নস্তো]
জ্যামিতি [জ্যামিতি]	প্রব্রজ্যা [প্রোব্‌ব্রোজ-জা]
	সত্যি [সোত্‌-তি]
	অভ্যুদয় [ওব্‌-ভু-দয়্‌]

"আর দুটো কথা মনে রাখতে হবে", হিগিনকাকু হাত তুললেন, "শুধু য-ফলা শব্দের গোড়ায় 'অ্যা', অন্য জায়গায় 'অ' বা 'ও'। য-ফলা আ-কার গোড়াতে 'অ্যা', অন্যত্র সাধারণ ভাবে 'আ'। এবার ভন্টু, বাবা, বলো তো 'হ্য'-র আচরণ কীরূপ?"

ভন্টু ভেবে নিয়ে বলল, "পারব কাকু! শব্দের গোড়ায় 'হ্যা' আর অন্যত্র 'জ্‌ঝ'। যেমন 'হ্যাদে', 'হ্যাঁচ্চো'। কিন্তু সহ্য [শোজ্‌ঝো], দাহ্য [দাজ্‌ঝো]।"

'বিউটিফুল!' বলে হিগিন কাকু চোখ বুজে ভন্টুর মাথায় হাত রাখলেন।

'তবে একটা কথা মনে রেখো কমরেডস্‌।' হিগিনকাবু হঠাৎ বামপন্থী হয়ে গেলেন চোখ খুলে। ব্যঞ্জন ডবল হচ্ছে মানে খ্‌ হচ্ছে ক্‌খ্‌, ঝ্‌ হচ্ছে জ্‌ঝ, থ্‌ হচ্ছে ত্‌থ্‌, ফ হচ্ছে প্‌ফ্‌। অর্থাৎ যেগুলোকে আমরা মহাপ্রাণ ধ্বনি বলি, সেগুলো অল্পপ্রাণ+মহাপ্রাণ হয়ে যাচ্ছে। অল্পপ্রাণ গুলো শুধুই ডবল হচ্ছে। 'তবে আরও একটা কথা মনে রেখো কমরেড্‌স'—হিগিনকাবু এখনও বামপন্থী—'উদ্যোগ' কথাটাকে কেউ কেউ বলে উদ্দোগ, কেউ বলে 'উদ্‌যোগ।' দুটোই হয়।'

ব-ফলা বিষয়ে গ-বো

"য-ফলার আচরণ দেখলে তোমরা জনগণ," হিগিনকাকু বললেন, "কিন্তু ব-ফলার আচরণও কম মজাদার নয়। শব্দের গোড়ায় ব-ফলা মানে সে ফেকলু, তাকে কেউ গেরাহ্যিই করে না। ধরো 'শ্বাস'। আমরা কী বলি? না 'শাশ্'। বানানে ওই ব-ফলা যে রয়েছে, তাকে পাত্তাই দিই না। কিন্তু শব্দের গোড়ায় না থাকলে ব-ফলা তার শোধ তোলে। তখন সে ঘাড়ে চেপে থাকা বা লেগে থাকা ব্যঞ্জনটাকে ডবল করে দেয়! যেমন 'বিশ্বাস'। উচ্চারণ—'বিশ্-শাশ'। 'স্বভাব' উচ্চারণে 'শভাব্', কিন্তু 'নিজস্ব' হল 'নিজশ্শো'। 'ক্বাথ' হল 'কাথ', কিন্তু 'পক্ব' হল 'পক্কো'। 'ত্বক' উচ্চারণ করি 'তক', কিন্তু 'স্বত্ব' হল 'শত্তো'। বুঝলে মহাশয়গণ?"

ভন্টু শুনতে শুনতে প্রায় হাঁপিয়ে উঠেছিল, বলল, "বাবা রে, কাকু, এ কী কাণ্ড! তাহলে ব-ফলার দেখছি য-ফলারই দশা। শব্দের গোড়ায় নিরুদ্দেশ

উচ্চারণে, শব্দের মাঝখানে ব্যঞ্জনকে ডবল করে দেওয়া।"

হিগিনকাকু বললেন, "গ-বো, লিখে নাও ব-ফলার ব্যাভার একটু আলাদা।"

বাবা বললেন, "দাঁড়া, দাঁড়া, গ-বো কথাটার মানে কী?"

'জান না বুঝি? কাশীতে অনেক গাধা আছে জান তো? ওখানে ছেলে-মেয়েরা যখন পরীক্ষার পড়া পড়ে তখন যদি আশেপাশে কোনো গাধা 'ঘ-ক্ক ঘ-ক্ক' করে ডেকে ওঠে, সেই মুহূর্তে ছেলেমেয়েরা সেই পড়াটার পাশে লিখে দেয় গ-বো, মানে 'গধা বোলা'—গাধা ডেকেছে! তার মানে ওটা ইম্‌পরট্যান্‌ট—! আমার কথাটাও জরুরি, তাই বললাম গ-বো!'

বাবা ভন্টু দুজনেই হাসতে লাগল।

হিগিনকাকু বললেন, "য-ফলার তুলনায় ব-ফলার ক্ষেত্রে ব্যতিক্রমটা হল, কোনো-কোনো শব্দে ব-এর উচ্চারণ রয়ে গেছে—উবে যায়নি, ব্যঞ্জনকে ডবলও করেনি। ভন্টু, এই লিস্টিটা লিখে রাখো বাবা। উদ্বেগ উচ্চারণে 'উদ্দেগ' নয়, 'উদ্‌বেগ,' 'উদ্বাস্তু', 'উদ্‌বাস্তু', 'উদ্বর্তন' 'উদ্‌বর্তন', 'উদ্বাহ' 'উদ্‌বাহ', 'উদ্বাহু' 'উদ্‌বাহু', 'উদ্বুদ্ধ' 'উদ্‌বুদ্ধ'। বুঝেছ? সংস্কৃতে এই 'ব' বর্গীয় ব ছিল, অন্তঃস্থ ছিল না—কিন্তু তা জেনে কোনো লাভ নেই। কথাগুলো খেয়াল রেখো। ওই গ-বো!"

ম-ফলা ঃ হাতে রইল চন্দ্রবিন্দু

"ত্রি-ফলা'র ম-ফলা বাকি রইল তাহলে।" ভন্টুর বাবা বললেন ফাঁক পেয়ে।

"বাকি থাকতে দেব কেন?" হিগিনকাকু হুমকি দিলেন, "আমি যখন একবার ধরেছি তখন সব ব্যাটাকে শেষ না করে ছাড়ব ভেবেছ? এখন শোনো, ম-ফলার ব্যবহারও অনেকটা ব-ফলার মতো। সাধারণ ভাবে ম-ফলার ম উচ্চারণে থাকে না। শব্দের গোড়াকার যুক্তব্যঞ্জনে ম একদম বেপাত্তা। খুব 'শুদ্ধ' বা সচেতন উচ্চারণে সে একটা চন্দ্রবিন্দুর নাকিস্বর রেখে যায় মাত্র," বলে হিগিনকাকু একটা পুরোনো গান ধরলেন—

"শুধু সে রেখে গেছে চরণরেখা গো,
ছেঁড়া এ ছাতাখানি, বাঁশের ডাঁটা গো।

অর্থাৎ কিনা, এ গানটার প্রসঙ্গ-উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা হল—শব্দের গোড়ায় ম-ফলার ম সম্পূর্ণ উধাও—যোগফল শূন্য, হাতে রইল চন্দ্রবিন্দু। এই কথাগুলো শোনো—স্মরণ [শঁরোন্], স্মৃতি [সৃঁতি], স্মার্তো [শাঁর্তো] স্মিত [শিঁতো]। শেষ দুটো কথায় আজকাল বানান দেখে অনেকে 'স্মার্তো' আর 'স্মিতো' বলে, ম-ফলা

উচ্চারণ করে। এটা ওই বানান-পড়া উচ্চারণ—spelling pronunciation। পুরোনো উচ্চারণ আমি যা বললাম তাই।"

"আর শব্দের গোড়ায় যদি ম-ফলা না থাকে, অন্য জায়গায় থাকে?" ভন্টু জিজ্ঞেস করল। সে বুঝে গেছে শব্দের গোড়ায়, না গোড়ায় নয়—এ কথাটা খুব জরুরি।

"গোড়ায় না থাকলে ওই য-ফলা ব-ফলার মতোই ব্যঞ্জনটাকে ডবল করে বিদায় নিচ্ছে—যেমন 'বিস্মরণ' [বিশ্-শঁরোন্], 'বিস্ময়' [বিশ্-শঁয়]; 'আত্মা' [আঁত্তা], 'পদ্ম' [পদ্দোঁ], 'লক্ষ্মী' [লোক্খিঁ], 'রুক্মিণী' [রুক্কিনি]। লক্ষ করো, সব জায়গায় চন্দ্রবিন্দু লাগছে না। মুখের কথায় লোকে অত খেয়াল করে না।"

বাবা স্লোগান দিলেন, "আমাদের দাবি মানতে হবে, ব্যতিক্রমের কথা বলতে হবে।"

"ব্যতিক্রম সবই শব্দের মাঝখানে। সেখানে যেমন ম উচ্চারণ হচ্ছে সেটাই ব্যতিক্রম। যেমন সুস্মিতা [শুশ্মিতা], শুচিস্মিতা [শুচিশ্মিত]—কেউ কেউ শুচিশ্-শিঁতাও বলে, আবার কেউ 'স্মিত'-কে ম-ফলা দিয়ে উচ্চারণ করে], 'কাশ্মীর', 'গুল্ম', 'বাগ্মী' [কেউ কেউ পুরোনো ধরনে 'বাগ্-গিঁ'ও বলে], 'যুগ্ম' [জুগ্মো]। এর কিছু শব্দে বানানোর চোখ-রাঙানিতে ঘাবড়ে গিয়ে আমরা 'ম' বলতে শুরু করেছি।" বলে হিগিনকাকু থামলেন। থেমে বললেন, "রান্নাঘরের দিকটা এত নিঃশব্দ কেন?"

অন্য যুক্তব্যঞ্জন কী বলে
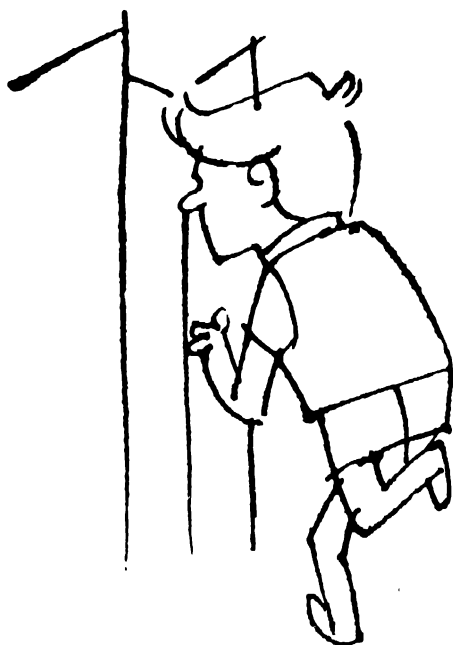
"রান্নাঘরের দিকটা এত নিঃশব্দ কেন" শুনেই ভন্টু দৌড়ে রান্নাঘরে চলে গেল। ফিরে এসে বলল, "মা বলছে, চিকেন স্যান্ডউইচ বানাতে কি ছ্যাঁক-ছোঁক শব্দ হয়?" হিগিনকাকু লজ্জিত হয়ে বললেন, "না, মানে বৌদি তো একটু গুনগুন করে গানও গাইতে পারত রান্নাঘরে, তাতে চিকেন-স্যান্ডউইচের স্বাদ বাড়ত বই কমত না! যা হোক, এবার ভাষাবিজ্ঞানে—"

"আর সব যুক্তব্যঞ্জনের উচ্চারণে কোনো গোলমাল আছে?" ভন্টু জিজ্ঞেস করল।

"ক্ষ আর জ্ঞ-এর কথা বলেছি তোমাদের। শব্দের গোড়ায় এ দুজনের উচ্চারণ যথাক্রমে খ আর গঁ, আর গোড়ায় না থাকলে ক্‌খ আর গ্‌গ। তুলনা করে দ্যাখো—

ক্ষয় [খয়্] অক্ষয় [অক্‌খয়্]

ক্ষুব্ধ [খুব্‌ধো] বিক্ষুব্ধ [বিক্‌খুব্‌ধো]

ক্ষুর [খুর্] গোক্ষুর [গোক্‌খুর্]

ক্ষতি [খোতি] লক্ষ [লোক্‌খো]

জ্ঞান [গ্যান্] বিজ্ঞান [বিগ্‌গ্যান্, বিগ্‌গান্]
জ্ঞাত [গ্যাঁতো] অজ্ঞাত [অগ্‌গ্যাঁতো, অগ্‌গাঁতো]

"আর ঋ-কার আর র-ফলার তফাত দেখিয়েছি আগে । শব্দের গোড়ায় দুয়েরই একরকমের উচ্চারণ—'পৃথিবি'র 'পৃ' আর 'প্রীতি'র 'প্রী'-এর উচ্চারণে কোনো পার্থক্য নেই। কিন্তু শব্দের গোড়ায় না হলে—" ভন্টু বাবা বলে উঠলেন "র-ফলার আগের ব্যঞ্জনটা ডবল হবে তো? সে আর তোকে বলতে হবে না, সে আমরা আগেই ধরে নিয়েছি।"

বাবার ওপর ভন্টুর অভিমান হল একটু সে-ই এ-কথাটা বলতে যাচ্ছিল।

হিগিনকাকু বললেন, "ঠিক। যেমন 'বিকৃত' [বি-ক্রিতো,] কিন্তু 'বিক্রীত' [বিক্‌+ক্রিতো], 'মাতৃকুল' [মাত্রিকুল্] কিন্তু 'মৈত্রী' [মৈৎ-ত্রি]।, শ্রী [স্রি], কিন্তু বিশ্রী [বিস্-স্রি]। দ্যাখো, ল-ফলাতেও একই ঘটনা—শ্লীল্ [স্লিল্] কিন্তু অশ্লীল অস্-স্লিল্]।

"আর তিন নম্বর যে-কথাটা ইম্‌পরট্যান্ট—তা হল—সেটাও 'ও' প্রসঙ্গে বলেছি, শব্দের গোড়ায় র-ফলা-ওয়ালা বর্ণ থাকলে তার 'নিহিত' অ-টা 'ও' উচ্চারণ হয়, যেমন প্রথম [প্রোথোম], দ্রবণ [দ্রোবোন্], শ্রবণ [স্রোবোন্], গ্রহণ [গ্রোহোন্]। কেবল 'ক্রন্দন'-এ অ-ও শুনতে পাই।

এমন সময় প্লেটভর্তি স্যান্ডউইচ এসে ভাষাবিজ্ঞানচর্চাকে লণ্ডভণ্ড করে দিল।

জায়গাবদল

"বন্ধুগণ, ত্রি-ফলার আচরণ লক্ষ করলেন।" স্যান্ডউইচের খান-তিনেক পেটে চালান করে দিয়ে হিগিনকাকুর গলায় বেশ তেজ এসেছে বলে মনে হল। "এনারা তিনজনাতেই শব্দের গোড়ায় চুপচাপ ঘাপটি মেরে থাকেন কিন্তু মাঝখানে ধাক্কাধাক্কি করেন—ব্যঞ্জনটাকে ডবল করে দ্যান। 'ক্ষ' 'জ্ঞ'-এর ব্যবহারও প্রায় একই রকম, গোড়াতে শান্তশিষ্ট, মাঝখানে ধুমধাড়াক্কা।"

ভন্টুর বাবা বলেন, "কিন্তু হিগিনবথাম, ভাই, আমি তোমাকে 'হ্ন' আর 'হ্ণ' এবং 'হ্ম'-এর বিষয়ে একটু জিজ্ঞেস করব ভেবেছিলাম। এরা কী করে?"

"ওঃ, বড়দা, এদের নিয়ে বিশেষ ভাবনা নেই। এরা তো শব্দের গোড়ায় থাকেই না। তবে হ্ন (হ-এ দন্ত্য ন) এবং হ্ণ (হ-এ মূর্ধন্য ণ) বিষয়ে যেটা মজার কথা তা হল, এদের ব্যঞ্জনদুটো আমাদের উচ্চারণে জায়গা-পালটাপালটি করে নেয়।"

"তার মানে?"

"মানেটা দ্যাখো না। আগে হ পরে ন তো দুটোতেই? কিন্তু আমরা তো 'চিহ্নো' 'অপরাহ্নো' উচ্চারণ করি না। সে করা ভারী শক্ত। খুব শুদ্ধ করে বললে আমরা বলি 'চিন্‌হো' 'অপরান্‌হো'। ন-টা আগে চলে আসে, হ-টা পরে

চলে যায়। ধ্বনির এই জায়গা-বদলাবদলির নাম ভাষাবিজ্ঞানে 'বিপর্যাস'। ইংরেজিতে মেটাথিসিস।"

ভন্টু হঠাৎ হাত তুলে বলল, "আমাদের ক্লাসের ছেলেরা তো সোজাসুজি 'চিন্নো' 'মধ্যান্নো' বলে, 'ভিন্ন' 'মিষ্টান্নে'র মতোই।"

হিগিনকাকু ক্ষমার সুরে বললেন, "আহা, বেশিরভাগ লোকই তাই বলে। এই ধর্ না, আরেকটা যুক্তব্যঞ্জন—ওই 'হ্ম'। আমরা ক'জন 'ব্রাহ্মণ'-এক 'ব্রাম্‌হোন' বলি? বেশিরভাগই বলি 'ব্রাম্মোন', 'ব্রহ্মা' (ব্রহ্মা), 'ব্রম্মোদেশ'। শুদ্ধ অতি-সচেতন উচ্চারণে এখানেও 'হ' আর 'ম'-এর জায়গাবদল হয়। কিন্তু স্বাভাবিক উচ্চারণ দাঁড়ায় ওই 'ম্ম'।"

তারপর একটু বিষণ্ন হেসে বললেন, "হ বেচারার কপালটাই ওইরকম। স্প্যানিশে সে দুই স্বরধ্বনির মাঝখানে থাকলে উৎখাত হয়, আমাদের বাঙালদেশে কথার গোড়ায় সে উবে যায়—'অয় অয় Zানতি পার না'-তে যেমন, ইংরেজিতেও শব্দের মাঝখানে সে খসে যেতে চায়—আমরা যাকে বলি 'পারহ্যাপস', ওরা তাকে বলে 'প্র্যাপ্স্'।" হঠাৎ খুব নরম সুরে বললেন, "এবার তবে ওই ব্যাটাদের ধরব?"

"কাদের?" ভন্টু আর বাবা হতভম্ব।

"ওই পলাতক ফলা-দের।" বলে আবার যে সেই চোখ বুজলেন তা অচিরেই নাকের ডাকের সংগত নিয়ে অন্যরকম চেহারা নিল। ভন্টুরা পা টিপে-টিপে বেরিয়ে এল।

পলাতক ফলা-রা

ততক্ষণে কালো কফির সুগন্ধে হিগিনকাকুর নাকের ডাক বন্ধ হয়েছে, চোখ দুটিও একটু মিটমিট করে সম্পূর্ণ সজাগ হয়েছে। কফিতে চুমুক দিয়ে তিনি বললেন, "এই ধরো, শব্দের গোড়ায় র-ফলা আর ঋ-কার প্রায়ই অনেকের উচ্চারণে উধাও হয়। শোনোনি—'এখানে পোত্তেক (প্রত্যেক) বাড়িতে পোতিদিন (প্রতিদিন) পোচণ্ড (প্রচণ্ড) লোডশেডিং হয়। টিভির পোগ্রাম দেখাই হয় না'।"

বাবা বললেন, "পোফেসর বলেছেন, কী পোকাণ্ড এই পিথিবী!"

"দাঁড়াও, দাঁড়া," ভন্টু বাধা দিয়ে বলল, "আমাদের ক্লাসের একটা ছেলে সেদিন পড়া দিচ্ছিল। সে দিব্যি বলে গেল 'মিত্যু' (মৃত্যু), 'মিতদেহ' (মৃতদেহ)। কিন্তু সে যেই 'কিস্ন' (কৃষ্ণ) বলেছে, অমনি স্যার এসে তার কান ধরলেন, বললেন, 'কিস্ন', 'বিস্টি' (বৃষ্টি), 'বিদ্ধ' (বৃদ্ধ), 'পোত্তহ' (প্রত্যহ)—এসব কী কথা র‍্যা? কোন্ জঙ্গল থেকে এয়েছিস?"

"ওরে জঙ্গলে যাবার দরকার নেই, এসব এই কে এম ডি এ এলাকাতেই হরদম শোনা যায়।" হিগিনকাকু বললেন, "তবে কথাটা হচ্ছে, গোড়াকার ওই

র-ফলা আর ঋ-কারকে পালাতে দেওয়া চলবে না। শক্ত করে ধরে রাখতে হবে, জিভকে বলতে হবে—"অ্যাই-ও, খবরদার! র-ফলা যেন না ফসকায়! আর য-ফলা!

"সে কী কাকু, য-ফলাও ফসকে যায় নাকি?"

"আর বলিস্‌নে বাবা, শব্দের শেষে ঝুলে থাকা য-ফলা তাই-ই করে অনেকের কথায়। সেখানে য-ফলার উচ্চারণ কী, মনে আছে তো? যদি আগে একটাই ব্যঞ্জন থাকে, সে আগের ব্যঞ্জনটাকে ডবল করে ধাক্কা লাগায়, তাই না?"

"কিন্তু দ্যাখো, বেশ কিছু লোকের কথায় শুনবে, 'সৈন্য' [শোইন্নো] হয় 'শোইনো', 'দৈন্য' [দৈন্নো] হয় 'দোইনো', 'ঐক্য' [ওইক্কো] হয় 'ওইকো'—"

"আমি তো 'ওক্ক'-ও শুনি 'ঐক্য'-এর বদলে।"

"সে অন্যরকমের ভুল গো। তাতে 'ওই'-এর ই-টা খসে যায়। যাই হোক, তোমরা পলাতক 'ফলা'দের ধরে রাখো, এবার আমি নিজে পালাই।"

"নিজে পালাবি মানে?"

"মানে, আপাতত ভাষাবিজ্ঞানের আসর থেকে বিদায় নেব।" বলে ভন্টুর থুতনি ধরে আদর করে বললেন, "বলো তো সোনা, ভালো উচ্চারণের মোদ্দা কথা কী?" বলে নিজেই বললেন, "সে কথা হল, আক্কেল। খেয়াল রাখতে হবে কী বলছ, জিভকে কুঁড়েমি করতে দেওয়া চলবে না"—বলে একটু দম নিয়ে বললেন, "ভালো উচ্চারণের ক্লাস থেকে বিদায় নিচ্ছি বটে, কিন্তু এ-বাড়ির খাদ্যদ্রব্যকে বিদায় জানাচ্ছি না।"

—